KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-29
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/4 22/3 22/4 23/2	Year of Publication : Dec 1956 (আষাঢ় ১৩৬৪) (চৈত্র ১৩৬৫) (আষাঢ় ১৩৬৫) ((পৌষ ১৩৬৫)
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু

পৌষ ১৩৬৩
দাম এক টাকা

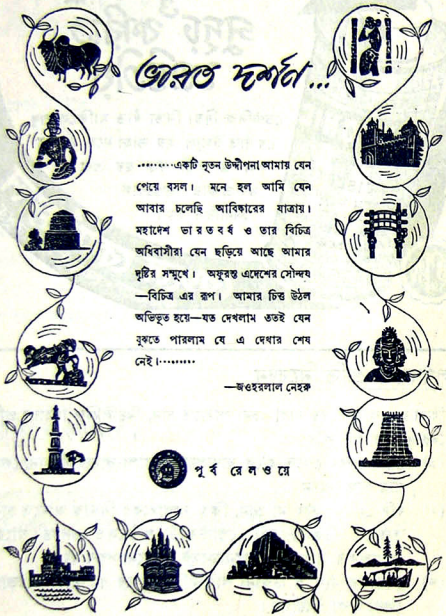

কবিতা
পৌষ ১৩৬৩
একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮৮

মেঘদূত

উত্তরমেঘ

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

৬৪

রয়েছে বিদ্যুৎ ললিত বনিতায়, ইন্দ্রধনু গৃহচিত্রে,
গানের আয়োজনে প্রহত পাখোয়াজে স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ,
স্বচ্ছ ভূমিতল[১] সজল মনে হয়, লেহন করে মেঘে তুঙ্গ চূড়া—
সৌধাবলী যেথা এ-সব লক্ষণে তোমারই অবিকল তুলনা।

৬৫[২]

হস্তে ধৃত লীলাকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
মুখের মধুরিমা লোধ্রপ্রসবের পরাগে হ'য়ে যায় পাণ্ডুর,
কর্ণে শোভা পায় শিরীষ মনোহর, তরুণ কুরুবকে কবরী,
এবং তুমি যারে ফোটাও, সেই নীপে সিঁথির প্রসাধন বধূদের।

৬৬[৩]

যেথায় তরুগণ নিয়তপুষ্পিত, মুখর উন্মাদ ভোমরায়,
নিত্য পদ্মের বিকাশ নলিনীতে, মরালশ্রেণী তার মেখলা,
ময়ূর নিত্যই কলাপে উজ্জ্বল, এবং কেকারবে উদ্‌গ্রীব,
নিত্য জ্যোৎস্নায় আঁধার কেটে যায়, তাই তো মনোরম সন্ধ্যা।

১। 'মণিময়ভুবঃ,' যার মেঝে মণিময়, এবং এত স্বচ্ছ যে মেঘের মতো 'অন্তস্তোয়ং' (যার ভিতরে জল আছে) ব'লে ভুল হয়।

২। পদ্ম শরতের ফুল, কুন্দকলি হেমন্তের, লোধ্র শীতের, কুরুবক বসন্তের, শিরীষ গ্রীষ্মের ও কদম্ব বর্ষার। অলকায় ছয় ঋতুর ফুল একসঙ্গে ফোটে।

৩। ৬৬ ও ৬৮ নং শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ব'লে ঘোষণা ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন; যেখানে সর্বদাই ফুল ফোটে আর রাত্রি কখনো অন্ধকার হয় না, এমন ভূস্বর্গের

৬৭

তারার ছায়া দেয় ছড়িয়ে ফুলদল[৩], ধবল মণিময় কুট্টিম,
যেথায় যক্ষেরা মিলিত, মনোমতো রূপসী বনিতার সঙ্গে,
সেবন করে ধীরে কল্পবৃক্ষের প্রসূত রতিফলমদ্য
ধ্বনিত হয় যবে উদার পাখোয়াজ তোমারই মতো মৃদু গম্ভীর।

৬৮

যেথায় তরুণীরা, অমরবাঞ্ছিতা, কনকসৈকতে ছুঁড়ে দেয়
হাতের মুঠো ভ'রে রত্নরাজি, পুন খেলাচ্ছলে করে সন্ধান,
এবং সেবা পায় শীতল অনিলের, মন্দাকিনী-বারি-স্পৃষ্ট,
বারণ করে তাপ ছায়ার বিস্তারে তটজ মন্দারবীথিকা।

৬৯

আকুল কামুকেরা আবেগভরে যেথা উচ্ছ্বসিত হাতে সহসা
নীবীর বন্ধন খসিয়ে, টেনে নেয় ক্ষৌম[৫] অংশুক স্খলমান,
বিম্বাধরাগণ, বিমূঢ় লজ্জায়, তখনই কুসুমমুষ্টি,
যদিও ছুঁড়ে দেয় দীপ্ত মণিদীপে, বিফল হয় সেই চেষ্টা।

৭০[৬]

সততগতিশীল বায়ুর চালনায় তোমারই অনুরূপ মেঘেরা
যখন উপনীত হয় সে-অলকার বিমানসমূহের শিখরে,
স্বজলকণিকার সংক্রমণে তারা দূষিত ক'রে দিয়ে চিত্রাবলী,
সদ্য শঙ্কায় পলায় বাতায়নে, ধোঁয়ার অনুকারে, শীর্ণ।

কল্পনা আমাদের কাছেও অগ্রাহ্য। কিন্তু ৬৫ ও ৬৬ নং শ্লোকে ভাবের সংগতি আছে; যেখানে বারোমাসের ফুল একসঙ্গে পাওয়া যায়, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চাঁদই বা উঠবে না কেন। মেয়েদের মণিনুক্তো নিয়ে বল্ খেলার ছবিটিও আমার মনে হ'লো রক্ষণের অযোগ্য নয়।

৪। স্ফটিকের মেঝেতে তারার আভা যেন ফুল ছিটিয়ে দিয়েছে— এই হ'লো মল্লিনাথের ব্যাখ্যা। তার মানে, এই বিলাসস্থলটি একটি বারান্দা বা খোলা চত্বর।

৫। ক্ষৌম=linen, ক্ষুমা শব্দের বিশেষণ, যার অর্থ flax বা তিসি। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে ক্ষুমা-র ধাতুগত অর্থ, 'যা পক্ক হ'লে শব্দিত হয়'।

৬। মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকের একটি ব্যঙ্গ্যার্থ আছে: দূতের সাহায্যে জার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে, এবং মেয়েদের মধ্যে ব্যভিচারদোষ উৎপাদন ক'রে ছদ্মবেশে কোনো ক্ষুদ্র পথে

৭১

তোমার আবরণ কখনো স'রে গেলে, অমল ইন্দুর কিরণে,
বিতানে লম্বিত চন্দ্রমণিদাম[৭] ক্ষরণ ক'রে জলবিন্দু
নিশীথে মুছে নেয় তাদের তনু থেকে রতির পরিণতি—ক্লান্তি—
পতির ভুজপাশে যে-সব নায়িকার শিথিল হ'য়ে এলো আলিঙ্গন।

৭২

যেথায় অক্ষয়-ধনিক যক্ষেরা নিত্য বৈভ্রাজ-কাননে
বেড়ায়, বারমুখী বিবুধবনিতার সঙ্গে আলাপনে বদ্ধ,
এবং সেখানেই যতেক কিন্নর মোহন রঞ্জিত কণ্ঠে
উচ্চ গান্ধারে গানের উচ্চারে রটায় কুবেরের কীর্তি।

৭৩

গতির কম্পনে কবরী-হ'তে-খসা খিন্ন মন্দারপুষ্প,
কর্ণবিচ্যুত সোনার শতদল, স্তনের উচ্ছ্বাসে ছিন্ন হার,
মুক্তাজাল, আর খণ্ড পত্রিকা[৮] যেথায় সবিতার উদয়ে
সূচনা ক'রে দেয় অনেক লক্ষণে নৈশ অভিসার মেয়েদের।

৭৪

কুবেরসখা শিব স্বয়ং অধিবাসী, এ-কথা জেনে কন্দর্প
ধরে না ভয়ে-ভয়ে প্রায়শ ধনু, যার ছিলায় মধুকরপংক্তি—
করেন তাঁর কাজ চতুর বনিতারা কামুকসন্ধানে নির্ভুল,
অমোঘ বিভ্রমে মিশিয়ে দৃষ্টিতে ভুরুর অপরূপ ভঙ্গি।

পালিয়ে গেলো। 'সততগতিশীল'-এর ব্যঙ্গ্যার্থ: অন্তঃপুরসঞ্চারী। উভয় অর্থেই 'স্বজলকণিকা-দোষম্'-এর সুষ্ঠুতা ভেবে আমরা বিস্মিত হই।

৭। চন্দ্রকান্ত বা চন্দ্রমণি: moonstone, 'বর্ণহীন স্বচ্ছ মণি, নাড়লে ভিতরে আকাশতুল্য আভা দেখা যায়।' (রাজশেখর বসু)। প্রবাদ, এই মণি চন্দ্রকিরণে গঠিত হ'য়ে চাঁদের আলোতেই বিগলিত হয়। শয্যার উপরে চাঁদোয়া আছে, আর তা থেকে বহুসূত্রে চন্দ্রমণি ঝুলছে; মধ্যরাত্রে চাঁদ যখন উজ্জ্বল, সেই আলোয় মণিসমূহ বিগলিত হ'য়ে বিন্দুরূপে ক্ষরিত হচ্ছে—ব্যাপারটা হ'লো এই।

৮। খণ্ড পত্রিকা, 'পত্রচ্ছেদ': সাংকেতিক পাতার টুকরো। এই টুকরোগুলো নানা ছাঁদে কাটা হ'তো, তা থেকে নায়িকা নায়কের অভিপ্রায় (বা মিলনস্থল) বুঝে নিতেন।

৭৫

যেথায় ললনার সকল প্রসাধন প্রসব করে এক কল্পতরু—
রঙিন বেশবাস, ভূষণ নানামতো, পুষ্পসহ-ফোঁটা কিশলয়,
অলক্তকরাগ, চরণকমলের প্রান্তে প্রলেপের যোগ্য,
এমন মধু, যার আদেশে দেখা দেয় নয়নে আবেশের বিভ্রম।

৭৬

কুবের-ভবনের খানিক উত্তরে দেখবে আমাদের নিকেতন,
চিনবে দূর থেকে ইন্দ্রধনুকের তুল্য মনোরম তোরণে,
প্রান্তে আছে তার আমারই কান্তার পালিত কৃত্রিমপুত্র—
তরুণ মন্দার,[৯] স্তবকভারে নত, বাড়ালে হাত তারে ছোঁয়া যায়।

৭৭

রয়েছে দিঘি এক, ঘাটের সারি যার কঠিন পান্নায় বাঁধানো,
হৈম অম্ভোজ কত না ফুটে আছে, মৃণালে জলে বৈদূর্য[১০]
যদিও দূরে নয় মানস, তবু সেই সলিলবাসী সব হংস
তোমার উদয়েও অনুৎকণ্ঠিত, হবে না যাত্রায় তৎপর।[১১]

৯। মন্দার : স্বর্গের পঞ্চপুষ্পের অন্যতম ; বাংলায় মাদার ('চলন্তিকা'), অথবা ডেহফল (ডেফল) গাছ ('বঙ্গীয় শব্দকোষ')। Monier-Williams একাধিক লাটিন নাম দিয়েছেন, তবে কালিদাসের মনে ঠিক কোন গাছ ছিলো, তা নিশ্চিত বলা সম্ভব মনে হয় না। মল্লিনাথ কল্পবৃক্ষ অর্থ করেছেন, কিন্তু নারীর নর্মবাক্যে যে-গাছে ফুল ফোটে (দ্র. ৭৯ নং শ্লোকের টীকা), এ যদি সেই গাছ হয়, তাহ'লে একে পার্থিব গাছ ব'লেই ধরতে হবে (কেননা স্বর্গের গাছে দোহদের প্রয়োজন হ'তে পারে না), এবং পার্থিব হ'লে কবিতার আবেদনও বেড়ে যায়।

১০। বৈদূর্য : বিদুর পর্বতে জাত মণিবিশেষ ; lapis lazuli বা নীলকান্ত ; যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে chrysoberyl। ১১। বর্ষাজনিত পঙ্কিলতা এড়াবার জন্য হাঁসেরা অন্য জল ছেড়ে মানস-সরোবরে চ'লে যায়, কিন্তু যক্ষের দিঘি চিরনির্মল, তাই মেঘ দেখেও তারা যাত্রার উদ্‌যোগ করে না।

৭৮[১২]

প্রমোদশৈলের ইন্দ্রনীলে গড়া শৃঙ্গ শোভা পায় তীরে তার,
কনককদলীর নিবিড় বেষ্টনে নয়ননন্দন দৃশ্য ;
তুমিও পরিবৃত স্ফুরিত বিদ্যুতে, বন্ধু, দেখে তা-ই দুঃখে—
ঘরনী তারে ভালোবাসেন ব'লে, আমি স্মরণ করি সেই শৈলে।

৭৯[১৩]

রেখেছে বেড়া দিয়ে ফুল্ল কুরুবক সেথায় মাধবীর বিতানে,
অদূরে কমনীয় বকুলতরু, আর কম্প্রকিশলয় রক্তাশোক ;
হে মেঘ, সে তোমার সখির বাম পদ আমারই মতো করে অভিলাষ,
অন্য জন তার দোহদ ছল ক'রে চায় যে বদনের মদিরা।

১২। ইন্দ্রনীল : নীলকান্তমণি। কনককদলী : স্বর্ণময় কৃত্রিম কলাগাছ। যক্ষের এই চিন্তাকে মল্লিনাথ বলেন শালগ্রামে হরিভাবনাদর্শন, fetish।

১৩। মল্লিনাথ বলছেন : নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু বিকশিত হয়, মুখমদ্যে বকুল, পদাঘাতে অশোক, দৃষ্টিপাতে তিল আর আলিঙ্গনে কুরুবক। মন্দার ফোটে নর্মবাক্যে, পটু বা মৃদু হাস্যে চাঁপা, মুখের বাতাসে (নিশ্বাসে) আম্রমুকুল, গানে নমেরু (রক্তাক্ষ) আর সামনে নৃত্য করলে কর্ণিকার (কনকচাঁপা বা সোঁদাল ফুল)। 'বদনমদিরা' মল্লিনাথের মতে গণ্ডূষমদ্য ; অর্থাৎ নায়িকা মুখে মদ নিয়ে কুলি ক'রে গাছের গায়ে দিচ্ছেন, কিন্তু নিশ্চিনও মানে হ'তে পারে, কেননা ঐ সদ্য যক্ষেরও আকাঙ্ক্ষিত। দোহদ : যার প্রয়োগে গাছে অকালে ফুল ফোটে ; গর্ভিণীর স্পৃহা। Monier-Williams-এর মতে এই শব্দ 'দৌর্হৃদ'এর প্রাকৃত রূপ, যার অর্থ হার্দ্য বিষাদ, বা বিবমিষা। শব্দটিতে গর্ভিণীদের বমনেচ্ছা আর নানারকম অদ্ভুত স্পৃহা দু-ই সূচিত হচ্ছে, কিন্তু এখানে 'দোহদ' অছিলামাত্র, বকুলের গাছে বমন করার কথা উঠছে না, প্রণয়কালীন মুখমদ্যই কাম্য। উপরন্তু স্মর্তব্য যে যক্ষপ্রিয়া নিঃসন্তান, দ্বারপ্রান্তে তরুণ মন্দার তার পালিত পুত্র) তাই দোহদের অভিজ্ঞতা তার নেই। অশোক ফুল লাল আর শাদা দু-রকমের হয় ; মল্লিনাথ বলেন লাল রং স্মরোদ্দীপক ব'লে রক্তাশোক উল্লিখিত হয়েছে, শাদা বকুলের সঙ্গে অন্য লাল ফুলের বর্ণসমাবেশও হয়তো কবির অভিপ্রেত ছিলো। মাধবী ফুলও লাল হয় ; 'মধু' শব্দের এক অর্থ বসন্ত ঋতু, বসন্তে ফুল ফোটে, তাই 'মাধবী' নাম।

উইলিয়ম জোন্স বলেছিলেন, পুষ্পিত অশোকতরুর চেয়ে মনোহর দৃশ্য উদ্ভিদজগতে কিছু নেই। তাঁকে সম্মান জানিয়ে লাটিনে এর নাম হয়েছে Jonesia asoka।

৮০

সে-দুটি বৃক্ষের মধ্যে লম্বিত দেখবে কাঞ্চনযষ্টি,
ফলক স্ফটিকের, মণিতে বাঁধা মূল, তরুণ বেণু যেন বর্ণে,
দিবস গত হ'লে সেথায় এসে বসে তোমার সখা নীলকণ্ঠ[১৪]—
রুণিত বলয়ের ললিত করতালে নাচায় তারে যবে কান্তা।

৮১

স্মরণে অঙ্কিত এ-সব লক্ষণে এবং নিজ নৈপুণ্যে
দ্বারের পাশে আঁকা শঙ্খপদ্মের[১৫] চিত্র দেখে তুমি চিনবে—
অধুনা যে-ভবন আমার বিচ্ছেদে মলিন হ'য়ে আছে নিশ্চয়,
কমল কখনো কি আপন রূপ ধরে সূর্য রয় যদি আড়ালে!

৮২

সহজ প্রবেশের উপায় বলি, শোনো : করভ[১৬]-রূপ নিয়ে সদ্য
পূর্বকথিত যে-প্রমোদগিরি, তার রম্য সানুদেশে বসবে,
স্বল্পবিলসিত আভাসে নেভে, জ্বলে যেমন জোনাকির পুঞ্জ,
তেমনি বিজলীর স্ফুরিত দৃষ্টিতে তাকাবে ভবনের মধ্যে।

১৪। ময়ূর।

১৫। 'শঙ্খ ও পদ্ম কুবেরের নবনিধির অন্তর্গত। এই দুইএর মূর্তি মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে মনুষ্যাকারে চিত্রিত হ'ত।' (রাজশেখর বসু)। এই দুই বস্তুই বিষ্ণু ধারণ করেন; বেদপরবর্তী হিন্দু মানসে পদ্মের পবিত্রতা অসীম, শঙ্খের মর্যাদাও কম নয়। আমরা এ-দুটিকে শুভচিহ্নরূপে গ্রহণ ক'রেই তৃপ্ত ছিলাম, কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাদের গাণিতিক মূল্য উল্লেখ ক'রে আমাদের মনে দুঃখ দিয়েছেন। তাঁর মতে ঐ চিহ্নদ্বয় যক্ষের ধনের বিজ্ঞাপন : এক পদ্ম+এক শঙ্খ= ১১০০০০০০০০০০ 'টাকা' তার আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র' লিখেছিলেন, নিশ্চয়ই এ-অর্থ ভাবেননি?

১৬। হস্তীশাবক।

৮৩[১৭]

তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘন গুরু ব'লে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি,
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

৮৪

আমি-যে সহচর গিয়েছি দূরে, তাই একেলা যেন এক চক্রবাকী,
ক্বচিৎ কথা বলে, দীর্ঘ এই দিন কাটায় ঘোর উৎকণ্ঠায়,
তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী, অন্যরূপা তাকে মনে হয়—
জলদ, তুমি তাকে আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রাণ ব'লে জানবে।

৮৫

ব্যাকুল, অবিরল রোদনে রঞ্জিত বিস্ফারিত আঁখি প্রেয়সীর,
অধরশোণিমার বর্ণ অপগত, শীতল নয় ব'লে নিশ্বাস,
স্রস্ত কেশ আর ন্যস্ত কর, তাই যায় না দেখা মুখ অবিকল—
যেথায় মুকুরিত তোমার তাড়নায় পীড়িত ইন্দুর দৈন্য।

১৭। 'শ্যামা': মল্লিনাথের মতে যুবতী বা মধ্যযৌবনা, রাজশেখর বসু অন্যান্য অর্থ দিয়েছেন, 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী যার গাত্র শীতকালে সুখোষ্ণ, গ্রীষ্মে সুখশীতল, শ্যামাঙ্গী (brunette)।' Monier-Williams-এর মতে 'শ্যামা' অর্থ বিশেষ লক্ষণযুক্ত নারী—(১) যার দেহে ঋতুলক্ষণ প্রকট, (২) যার সন্তান হয়নি, (৩) ক্ষীণাঙ্গী। মনে হয় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা আর নিঃসন্তান এই দুটি অর্থ গ্রহণ করলে প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে সংগত হয়। ('তারুণ্য এবং তন্বীতার উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে আছে। সূক্ষ্মদন্তিনী ('শিখরিদশনা') নারী মল্লিনাথের মতে ভাগ্যবতী, তার পতি দীর্ঘায়ু লাভ করে। বিম্ব : তেলাকুচো ফল, পাকলে টুকটুকে লাল হয়, আকারেও অনেকটা ঠোঁটের মতো। 'নিম্ননাভি' : মল্লিনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাভি গভীর হ'লে কামের তীব্রতা ('মদনাতিরেক') বোঝায়। 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা'— পদ্মিনী নারীর চোখের কোণা লাল হয় আর দৃষ্টি চকিতমৃগসদৃশ। নারীর শ্রেণীবিভাগে পদ্মিনীর স্থান সর্বোচ্চে, এবং এই শ্লোকে নারীসৌন্দর্যের যে-আদর্শ বিধৃত হয়েছে, অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

৮৬

বুঝি বা সেক্ষণে পূজায় মনোযোগী[১৮]— দেখতে পাবে তারে অচিরে,
অথবা অনুমানে আঁকছে প্রতিকৃতি বিরহে-ক্ষীণতনু আমারই,
শুধায় নতুবা সে— মঞ্জু বাণী যার, পিঞ্জরিতা সেই সারিকায়,[১৯]
'সোহাগী তুই তাঁর, স্বামীরে কখনো কি পড়ে না মনে, ওলো রসিকা ?'

৮৭

মলিন বেশবাসে বুঝি বা ব'সে আছে, অঙ্কে এলায়িত বীণা তার,
আমার নাম-লেখা গানের পদাবলী উচ্চারণে করে চেষ্টা,
অথচ অশ্রুতে আর্দ্র বীণাতার যত না মুছে নেয় আঙুলে,
যতনে বিরচিত আসন মূর্ছনা তবু সে বার-বার ভুলে যায়।

৮৮

রেখেছে প্রতিদিন ভবন-দেহলীতে[২০] একটি ক'রে ফুল সাজিয়ে,
ভূমিতে রেখে তা-ই বিরহ-সময়ের অবধি করে বুঝি গণনা ;
কিংবা সে আমার সঙ্গ করে ভোগ, কল্পনায় যার জন্ম—
প্রায়শ এইমতো বিনোদ[২১] খুঁজে নেয় রমণবিরহিণী মেয়েরা।

১৮। পূজায় মনোযোগী, 'বলিব্যাকুলা' : পতির প্রত্যাগমনের উদ্দেশে যক্ষপ্রিয়া প্রত্যহ পূজা করে ; Wilson লিখেছেন এই পূজার নাম কাকবলি, এটি বর্ষাগমে বিরহিণীদের কৃত্য।

১৯। সারিকা (সারী, শারী) কী পাখি ? সত্যচরণ লাহার মতে পাহাড়ি ময়না (শালিখ নয়), ইংরেজিতে grackle, এই পাখি কথা বলায় ওস্তাদ। শুক মানে টিয়াপাখি, জাতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; এ-দুয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ লোকপ্রবাদ মাত্র। সংস্কৃতে 'সারিকা' বলতে শালিখও বোঝাতো।

২০। 'দেহলী' : চৌকাঠ বা দাওয়া। 'সম্ভবত যক্ষপত্নী গৃহদ্বারের কাছে কোনও পীঠের উপর প্রত্যহ একটি ক'রে ফুল রাখত আর মাঝে মাঝে তা নামিয়ে গুণে দেখত ৩৬৫ দিন পূরণের কত বাকি।' (রাজশেখর বসু)

২১। বিনোদ : যার দ্বারা বিনোদন হয়, অবসরযাপনের উপায়। আধুনিক বাংলায় শব্দটির এই অর্থ প্রচলিত হ'লে কবিরা লাভবান হবেন।

৮৯

ব্যস্ত দিনমানে তোমার সখী নয় বিরহভারে তত খিন্ন,
কিন্তু মানি ভয়, বিনোদব্যতিরেকে দুঃখে ভরা তার যামিনী ;
দেখবে সাধ্বীরে ভূতলশয্যায়, নিদ্রালেশ নেই চক্ষে,
মহৎ সুখ দিয়ো, সৌধবাতায়নে আমার সমাচার জানিয়ে।

৯০

বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তবু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত,
যে-নিশি কাটিয়েছি দু-জনে স্বেচ্ছায় রতির উচ্ছ্বাসে ক্ষণিকে,
এখন বিচ্ছেদে দীর্ঘায়িত হ'য়ে অশ্রুজলে হয় অবসান।

৯১

এখনো জানালায় শীতল চন্দ্রমা ছড়ায় অমৃতের স্পর্শ,
পূর্বপ্রীতিবশে দৃষ্টি ছোটে তার, কিন্তু ফিরে আসে তথনই,
অশেষ বেদনায় নয়ন ঢেকে যায় অশ্রুভারাতুর পক্ষ্মে—
মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী, জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে[২২]।

৯২

শুদ্ধস্নান[২৩] করে, অলক অতএব রুক্ষ হ'য়ে, বিস্রস্ত,
কপোলে নেমে আসে, তাপিত নিশ্বাসে ক্লিষ্ট অধরের কিশলয় ;
ঘুমেরে সাধে কত, যদি বা অন্তত স্বপ্নে বুকে পায় আমাকে,
অথচ কান্নার আক্রমণে তার কোথায় সুপ্তির অবকাশ।

২২। 'তুহিনমন্থনে যেমন পদ্মিনী' (শ্লোক ৮৪) তুলনীয়। ৮৩ শ্লোকে যক্ষপ্রিয়ার স্বাভাবিক রূপ বর্ণিত হয়েছে ; তার অব্যবহিত পরেই বলবার দরকার ছিলো যে তার বর্তমান রূপ অন্য রকম ; শীতাহত পদ্মের মতো তারও এখন প্রাকৃত শ্রী অবলুপ্ত। কিন্তু শীতের পদ্ম মুমূর্ষু ; যক্ষপ্রিয়ার তবু আশা আছে, তাই কবি আবার পদ্মের উপমাই অন্য ভাবে ব্যবহার করলেন ; 'জেগেও নেই ঘুমিয়েও নেই' এই মন্তব্যে অবসাদ আর নবজীবনের সম্ভাবনা দুটোই বোঝা গেলো। মেঘ কেটে গেলে পদ্ম জেগে উঠবে, তেমনি যক্ষ ফিরে এলে, বা মেঘের বাণী শুনে, যক্ষপ্রিয়ার পুনরুজ্জীবন হবে।

২৩। প্রসাধনহীন স্নান। এখানে যক্ষপ্রিয়ার রোদনে লজ্জাত্যাগ সূচিত হচ্ছে, এই হ'লো মল্লিনাথের মত, কিন্তু আমরা একে লজ্জাত্যাগ বলি না।

৯৩

মাল্য ফেলে দিয়ে বেঁধেছে একবেণী বিরহদিবসের প্রথমে,
শাপের অবসানে বিগতশোক আমি ছাড়ায়ে দেবো তার গ্রন্থি,
পরশে কর্কশ কঠিন বেণী সেই গণ্ডদেশ থেকে বার-বার
যে-হাতে ঠেলে দেয়, হেলায় এতকাল কাটে না তার নখপংক্তি।

৯৪[২৪]

অসহ বেদনায় কখনো উঠে বসে, এমনি বার-বার শয্যাতলে
ভূষণবর্জিত পেলব তনু তার ন্যস্ত করে সেই অবলা,
নবীন জলময় অশ্রু নিশ্চয় মোচন করাবে সে তোমাকেও,
অন্তরাত্মায় আর্দ্র যারা, প্রায় করুণাশীল তারা সকলেই।

৯৫

তোমার সখী তার স্নেহের সম্ভার, জেনেছি, আমাকেই দিতে চায়,
তাই তো অনুমান, প্রথম বিচ্ছেদে এমনি শোচনীয় দশা তার ;
এ নয় বাচালতা— 'ভাগ্যবান[২৫] আমি,' তা ভেবে, অভিমানবশত,
আমার বিবরণ অচিরে অবিকল আপন চোখে, ভাই, দেখবে।

২৪। ৮৩ শ্লোকে যে-বিরহাবস্থার বর্ণনা শুরু হয়েছে, এই শ্লোক তার চরম পরিণতি। মল্লিনাথ প্রণয়ের দশ অবস্থার উল্লেখ করেছেন : চক্ষুপ্রীতি, মনঃপ্রীতি, সঙ্গসংকল্প, অনিদ্রা, কৃশতা, অবসাদ, ব্রীড়াত্যাগ, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু। যক্ষপ্রিয়া নবম দশায় পৌঁচেছে, এখন মেঘ যক্ষের বার্তা জানিয়ে শীঘ্র তার প্রাণরক্ষা করুক।

সংস্কৃত সমালোচনা (কবিতার মতোই) কিছুটা আঙ্কারিক পথে চলতো : এই অংশে প্রণয়ের প্রথম দশার (চক্ষুপ্রীতি) উল্লেখ নেই, মল্লিনাথ তা লক্ষ্য করতে ভোলেননি, এবং কবির এই অবহেলার সমর্থনে দীর্ঘায়িত যুক্তিও দিয়েছেন। নায়ক-নায়িকা (সম্ভবত বহুকাল ধ'রে) বিবাহিত, অতএব চক্ষুপ্রীতির অবস্থা তারা পেরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আট দশা পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে কিনা, সে-বিষয়েও আমরা সন্দিহান ; কিন্তু যদি কিছু ব্যতিক্রম ঘ'টে থাকে, সেখানেই কালিদাসের কবিত্বগৌরব।

২৫। মূলে 'সুভগ', এক অর্থ ললনাপ্রিয়।

৯৬[২৬]

স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য,
স্বরার পরিহারে ভুলেছে ভ্রূবিলাস, এমন বাম আঁখি মৃগাক্ষীর
তোমার আগমনে ঊর্ধ্বকম্পিত আন্দোলনে হবে সুন্দর,
তুলনা সে-রূপের ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে চঞ্চল কুবলয়।

৯৭

গৌর বরনে যে তুলনা আনে মনে সরস কদলীর কাণ্ড,
দৈবে এক্ষণে আমার চিরচেনা মুক্তাজাল[২৭] যার ত্যাজিত,
আমার নখরের চিহ্ন নেই আর, লভে না সম্ভোগ-অন্তে
আমারই হস্তের সংবাহন-সুখ,[২৮] হবে সে-বাম উরু স্পন্দমান।

৯৮

যদি বা সেক্ষণে নিদ্রাসুখ তার ভাগ্যে জুটে থাকে দৈবাৎ,
জলদ, গরজনে বিরত, সাবধানে প্রহরকাল[২৯] থেকো অপেক্ষায় ;
বুঝি বা কোনোমতে স্বপ্নে অবশেষে প্রেমিক-আমি তার লব্ধ,
কণ্ঠ হ'তে সেই গাঢ় ভুজলতা সহসা বিচ্যুত কোরো না।

২৬। ৮৫ শ্লোক তুলনীয়— 'স্রস্ত কেশ আর ন্যস্ত কর, তাই যায় না দেখা মুখ অবিকল।' বিরহিণী চুলে তেল দেয় না, গালে হাত দিয়ে ভাবে, তাই তার মুখ অংশত আচ্ছাদিত। লুটিয়ে-পড়া চুলের জন্য তার চোখের প্রসারও অবরুদ্ধ, অর্থাৎ সে আড়চোখে তাকাতে পারে না। মেঘ দেখে তার বাঁ চোখ উপর দিকে স্পন্দিত হবে। পরের শ্লোকে বাম উরুর উল্লেখ আছে, মেয়েদের বাম অঙ্গের স্পন্দন শুভ লক্ষণ ব'লে গণ্য ; এবং কোনো প্রকট ভঙ্গির পরিবর্তে শুধু যে চোখ আর উরু স্পন্দিত হ'লো, তাতে এই বিষাদপ্রতিমার ছবিটি আরো স্পষ্ট হ'লো আমাদের মনে।

২৭। মুক্তার মেখলা : তার ঝালর উরু স্পর্শ করতো। আধুনিক পাশ্চাত্য নারীর বেল্টের মতো, মেখলাও বসনের উপরিভাগে কটিতে ধারণ করা হ'তো, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে এই ভূষণ সর্বদাই দেখা যায়।

২৮। সংবাহন : মর্দন, massage। ২৯ শ্লোক স্মর্তব্য : যক্ষ পত্নীর বাম পদ আকাঙ্ক্ষা করে, অর্থাৎ পা টিপে দিতে চায়। সম্ভোগের পরেও সে তা-ই ক'রে থাকে। বাৎস্যায়নে সংবাহনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা উভয় পক্ষেরই কৃত্য, আর তার কোনো সময়ও নির্দিষ্ট নেই। সম্ভোগাত্মিক পদসংবাহন যক্ষের ব্যক্তিগত অভ্যাস কিনা, না কি তার কোনো ঐতিহ্য আছে, আমি তা আবিষ্কার করতে পারিনি।

২৯। 'রতিরহস্যে'র উল্লেখ ক'রে মল্লিনাথ এক প্রহর অপেক্ষার যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে অক্ষম, কেননা স্বপ্নমিলন তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হ'তে পারে না।

৯৯

তোমার জলকণা ব্যাপ্ত যাতে, সেই বাতাসে[৩০] মানিনীরে জাগিয়ে
আননে আশ্বাস আনবে, মালতীর নবীন মুকুলের তুল্য[৩১]
লুকোবে বিদ্যুৎ, যখন সে তোমারে দেখবে অনিমেষে জানালায়,
তোমার ধ্বনিরূপ বচনে ধীরে-ধীরে বলবে এইমতো বার্তা :

১০০

"জানবে, অবিধবা,[৩২] অদ্ববাহ আমি, তোমার দয়িতের বন্ধু,
হৃদয়ে সমাচার বহন ক'রে তার তোমারই কাছে আজ আগত ;
স্নিগ্ধগম্ভীর স্বননে প্রবাসীর ত্বরান্বিত করি যাত্রা,
পথশ্রান্ত যে-পতিরা উৎসুক প্রিয়ার বেণীপাশমোচনে।"

(আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের মতে একটি স্বপ্নের দীর্ঘতম স্থায়িত্বকাল তিন মিনিট।) বরং এ-কথা ভাবা সংগত মনে হয় যে মেঘ রাত্রির শেষ যামে বিরহিণীর বাতায়নে উপস্থিত হবে, এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত (ঘুম ভাঙার স্বাভাবিক সময় পর্যন্ত) নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে।

৩০। এটা যক্ষপ্রিয়ার প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা। মল্লিনাথ ভোজরাজের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'পায়ে মৃদুমর্দন, বুকে শীতল ব্যজন, বা মধুর গীতধ্বনি— এই হ'লো প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙাবার উপায়।'

৩১। মালতী: অভিধানের প্রথম অর্থে যূথীজাতীয় সান্ধ্য ফুল বোঝায়, কিন্তু মল্লিনাথ অর্থ দিয়েছেন জাতী, যা nutmeg (জায়ফল)-এর সমার্থক হ'তে পারে। পংক্তিটির দুই অর্থ সম্ভব: 'জেগে উঠলে প্রিয়াকে মালতীমুকুলের মতো প্রফুল্ল দেখাবে', বা 'মালতীকোরক যখন ফুটবে প্রিয়াও তখন জেগে উঠবে'। এখন মালতী যদি যূথী হয়, তাহ'লে ধ'রে নিতে হয় যক্ষপত্নী অপরাহ্ণে ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় মেঘের ব্যজনে জাগরিত হ'লো ; এই প্রস্তাব মেনে নেবার বাধা আছে, কেননা যক্ষপ্রিয়া নানা কাজে দিন কাটায় আর রাত্রে ঘুমের চেষ্টা করে (দ্র. ৮৯ শ্লোক)। তাছাড়া সুসংবাদ দেবার পক্ষে প্রাতঃকালই প্রশস্ত এবং রাত্রিশেষে আগত ও অপেক্ষমান মেঘের চিত্রই অধিক চিত্তগ্রাহী। আমার ধারণা, মালতীকে কোনো প্রাতঃকালীন ফুলের নামান্তর ব'লে ধরলেই ভাবের দিক থেকে সংগত হয়।

৩২। মেঘ প্রথমেই 'অবিধবা' ব'লে সম্বোধন ক'রে জানিয়ে দেবে যে যক্ষ এখনো বেঁচে আছে।

১০১

যেমন মৈথিলী পবননন্দনে, এ-কথা বলা হ'লে, সৌম্য,
জানিয়ে সম্মান, দেখবে তোমাকে সে আবেগে উন্মুখ হৃদয়ে ;
শুনবে একমনে যা বলা বাকি আছে, কেননা মিলনের তুলনায়
সুহৃৎ-উপহৃত কান্ত-সমাচার অল্প ন্যূন মানে বধূরা।

১০২

আমার অনুনয়ে, নিজেরও লাভহেতু,[৩৩] আয়ুষ্মন্, তুমি বলবে :
"তোমার সহচর, যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে।
অবলা, তোমারে সে কুশল জিজ্ঞাসে, প্রথমকৃত্য এ-প্রশ্ন,
কেননা প্রাণীদের জীবন অস্থির, বিপদ ঘটে অতি সহজে।

১০৩

"বৈরী বিধি আজ, রয়েছে দূরে তাই, নিষ্ক্রমণ অবরুদ্ধ,
কেবল মনোরথে তোমার অঙ্গে সে সঞ্চারিত করে অঙ্গ—
তোমার অতিকৃশ, সাশ্রুনিশ্বাসী, বেদনাতাপময় তনুতে
মিলায় সন্তাপী, দীর্ঘনিশ্বাসী, অশ্রুপ্লুত, ক্ষীণ তনু তার।

১০৪

"যে-কথা বলা যায় সহজে সোচ্চারে তোমার সখীদেরই সমুখে
তাও যে-লোভাতুর বলতো কানে-কানে আননপরশের লালসায়,
সে আজ, দৃষ্টির বহির্ভূত, আর শ্রবণবিষয়ের অগোচর,
আমার মুখ দিয়ে তোমায় বলে বাণী, রচিত ঘোর উৎকণ্ঠায় :

১০৫

" 'দেখি প্রিয়ঙ্গুতে[৩৪] তোমার তনুলতা, বদন বিম্বিত চন্দ্রে,
ময়ূরপুচ্ছের পুঞ্জে কেশভার, চকিত হরিণীতে ঈক্ষণ,
শীর্ণ তটিনীর ঢেউয়ের ভঙ্গিতে ভুরুর বিলসিত পতাকা,[৩৫]
কিন্তু, হায়, নেই তোমার উপমান কোথায় একযোগে, চণ্ডি![৩৬]

৩৩। পরোপকারে পুণ্য হয়, তাই মেঘেরও লাভ হবে।

৩৪। প্রিয়ঙ্গুলতা, মূলে 'শ্যামা': রাজশেখর বহুর মতে 'alamanda জাতীয়, হলদে ফুল হয়।' 'যার অঙ্গ প্রিয়দর্শন,' প্রিয়ঙ্গু শব্দের আক্ষরিক অর্থ এই, আর 'শ্যামা'রও এক অর্থ

১০৬

" 'অধুনা ধাতুরাগে[৩৭] শিলায় আঁকি আমি প্রণয়কোপবতী-তোমাকে,
সে-পটে আপনাকে লোটাতে চাই যদি তোমার চরণের প্রান্তে,
তখনই অশ্রুর প্লাবনে বার-বার লুপ্ত হ'য়ে যায় দৃষ্টি—
নিয়তি নির্দয়, চিত্রফলকেও মিলন আমাদের সহে না।

১০৭

" 'হে গুণবতি, শোনো যে-বায়ু দক্ষিণে তুষারগিরি হ'তে বহমান
সদ্য দেওদারে দীর্ণ কিশলয়ে গন্ধনিঃস্রাব ঝরিয়ে,
তোমার সুকুমার অঙ্গ বুঝি বা সে পরশ করেছিলো পূর্বে—
আমি সে-তনুহীন সুরভি বাতাসেরে আলিঙ্গনে বাঁধি অতএব।[৩৮]

(৮৩ শ্লোক দ্র.) মধ্যযৌবনা নারী। উপরন্তু, প্রিয়ঙ্গু লতায় নারীর স্পর্শে ফুল ফোটে (৭৯ শ্লোকের টীকা দ্র.)। ব্যাকরণ, অনুষঙ্গ ও সৌকুমার্য—তিন দিক থেকেই এই লতা প্রিয়ার দেহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

৩৫। মূলে 'ভ্রূবিলাস' আছে, কিন্তু মল্লিনাথের অনুসরণে আমি 'পতাকা' লিখলাম—পুনরুক্তি এড়াবার জন্য, আর চিত্ররূপ স্পষ্ট হবে ব'লে।

৩৬। যক্ষ এখানে পত্নীকে 'ক্রুদ্ধা' ব'লে সম্বোধন করছে কেন? মল্লিনাথের ব্যাখ্যা উজ্জ্বল: 'উপমানকথনমাত্রেণ ন কোপিতব্যমিতি ভাবঃ'। তোমার তুলনীয় কিছু আছে, এ-কথা বলামাত্রই রাগ কোরো না, কেননা—শেষ পংক্তিতে বলা হ'লো—তোমার রূপের তুলনীয় সত্যিই আর-কিছু নেই। কিন্তু নেই ব'লে যক্ষ সুখী নয়, 'হায়' শব্দে তার আক্ষেপ প্রকাশ পাচ্ছে।

৩৭। ধাতুরাগ: গেরিমাটি, পাহাড়েই তা পাওয়া যায়। পাথরের গায়ে পত্নীকে আঁকার পর যক্ষ নিজেকে তার পদতলে আঁকার চেষ্টা করতো, এই হ'লো মল্লিনাথের ব্যাখ্যা, কিন্তু রাজশেখর বসু একটি সরল অর্থ প্রস্তাব করেছেন, 'সে নিজেই চিত্রিত প্রিয়ার পায়ে পড়বার চেষ্টা করত।' মল্লিনাথের অর্থই সংগত, কেননা চোখের জল চিত্রাঙ্কনেরই অন্তরায় হ'তে পারে, পতনের নয়।

৩৮। নিরুক্তকারের টীকা—'বায়ু স্পৃশ্য, কিন্তু অমূর্ত, তাই আলিঙ্গনের অযোগ্য। যক্ষের এই কথা উন্মত্তের প্রলাপমাত্র, এই "আলিঙ্গন"ও নির্দোষ। (এতে যক্ষের চরিত্রদোষ ঘটেনি।)' নিরুক্তকারের নির্বুদ্ধিতায় মল্লিনাথ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলছেন: 'এই মন্তব্যই উন্মত্তের প্রলাপ, অতএব উপেক্ষণীয়।' আমরা সর্বান্তঃকরণে মল্লিনাথকে সমর্থন করি। ১০৫-৮ শ্লোকে বিরহ-দশার চার বিনোদ বর্ণিত হয়েছে; মল্লিনাথ 'গুণপতাকা' উদ্ধৃত ক'রে বলছেন যে বিয়োগের কালে

১০৮

" 'স্বপ্নে কোনোমতে তোমায় কাছে পেয়ে নিবিড় মিলনের জন্য
আমার প্রসারিত বাহুর উচ্ছ্বাস ব্যর্থ হয় যবে শূন্যে—
তা দেখে নিশ্চয়ই বনের দেবগণ মুহুর্মুহু তরুপত্রে
করেন নিপাতন করুণাপরবশ অশ্রুমুক্তার বিন্দু।

১০৯

" 'কেমনে ক্ষণিকের তুল্য ক'রে আনি দীর্ঘযামা এই ত্রিযামায়,[৩৯]
এবং দিনমান সর্বকালে হবে স্বল্পতাপ কোন উপায়ে—
এ-সব ভাবনার দারুণ সন্তাপ পায় না সান্ত্বনা কিছুতেই,
তোমার বিচ্ছেদব্যথায় নেই কোনো শরণ, হে চটুলনয়না!

১১০

" 'অনেক ভেবে আমি নিজেরই চেষ্টায় ধারণ ক'রে আছি নিজেকে,[৪০]
তুমিও, কল্যাণি, পরম পরিতাপে কোরো না আপনারে সমর্পণ;
এমন কে বা আছে, নিত্য দুঃখ বা নিয়ত সুখ জোটে ভাগ্যে,
কখনো উত্থান, কখনো অবনতি, মানবদশা যেন চক্রনেমি।

১১১

" 'রয়েছে চার মাস, যাপন করো তুমি ধৈর্যে, নিমীলিত নয়নে,
বিষ্ণু উঠবেন শয্যা ছেড়ে তাঁর,[৪১] আমার হবে শাপমুক্তি;
তখন পরিণত শরৎ-জ্যোৎস্নায় মিলনপুলকিত রাত্রে
পূর্ণ হবে সব, বিরহসঞ্চিত যা-কিছু আমাদের অভিলাষ।'

সান্ত্বনার উপায় সদৃশ, প্রতিকৃতি, স্বপ্নদর্শন ও অঙ্গস্পর্শ। প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদিতে যক্ষ প্রিয়ার সাদৃশ্য ভাবে, পাথরে তার ছবি আঁকার চেষ্টা করে, স্বপ্নে মিলিত হয়, প্রিয়ার অঙ্গস্পৃষ্ট বায়ুকে স্পর্শ করে। প্রতিকৃতি ও স্বপ্নদর্শন, এই দুই বিনোদ যক্ষপ্রিয়ারও ব্যবহৃত।

৩৯। যাম: প্রহর, তিন ঘণ্টা। রাত্রিকাল আসলে চতুর্যামব্যাপী, কিন্তু প্রথম ও শেষ যামার্ধ কার্যত দিনের অন্তর্গত ব'লে রাত্রির এক নাম ত্রিযামা।

৪০। মল্লিনাথ বলেন, পতির দুর্দশার বিবরণে পত্নী পাছে ভীত হয়, যক্ষ তাই ধৈর্যেরও পরিচয় দিলো।

৪১। অনন্ত বা শেষনাগ বিষ্ণুর শয্যা; বর্ষার চার মাস (১১ আষাঢ়-১১ কার্তিক) তিনি নিদ্রিত থাকেন, তাঁর উত্থানের তিথি কার্তিকের শুক্লা একাদশী। মিশরী দেবতা Horus-এর

১১২

"আরেক কথা শোনো, যক্ষ জানিয়েছে ;[৪২] 'একদা ছিলে যবে সুপ্তা
আমারই গলা ধ'রে যুগলশয্যায়, হঠাৎ কেঁদে উঠে জাগলে,
আমার বহুবিধ প্রশ্ন শুনে পরে বললে মৃদু হেসে— ধূর্ত !
স্বপ্নে দেখি তুমি রমণে উপগত অন্য কোন এক নায়িকায়।

১১৩

" 'দিলাম পরিচয়চিহ্ন, অতএব জানবে আমি আছি কুশলে,
তোমার কালো চোখে লোকের কথা শুনে যেন না দেখা দেয় অবিশ্বাস ;[৪৩]
বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয় নাকি, কিন্তু অভাবের প্রভাবে
আমার মনে হয় স্নেহের উপচয় মহৎ প্রেমে পায় পরিণাম।' "[৪৪]

বার্ষিক নিদ্রা তুলনীয় ; বিষ্ণুর যেমন বর্ষার, তেমনি তাঁর নিদ্রা নীল নদীর বন্যার প্রতীক, যে-বন্যা, ভারতের বর্ষার মতো, মিশরের সম্পদের নির্ভর।

মেঘদূত কালের দুই স্তর ; মেঘের ভ্রমণের আর যক্ষের বাচনের কাল। রামগিরি থেকে অলকায় পৌঁছতে মেঘের বহুদিন ব্যয় হবার কথা (পথে-পথে বিশ্রামের ও রাত্রিযাপনের উপদেশ আছে), কিন্তু মেঘের ভ্রমণ কাল্পনিক, এই কাব্যে অধিকৃত প্রকৃত কাল একদিন মাত্র (পয়লা আষাঢ়), যেদিন যক্ষ মেঘকে তার সবিস্তার আবেদন জানালে। অতএব শাপান্তের তারিখ পাঁজির হিশেবে ১লা কার্তিকে পড়ে ; অতিরিক্ত দশ দিন উক্ত হয়নি মল্লিনাথ তা লক্ষ্য করেছেন, কোনো আধুনিক পাঠক তা নিয়ে বিব্রত হবেন না।

৪২। দূতের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ তার মুখে একটি অতি গূঢ় অভিজ্ঞান পাঠাতে হয়— এমন কোনো কথা, যা প্রেরক ও প্রাপক ছাড়া কেউ জানে না। রামও হনুমানের মুখে সীতাকে অভিজ্ঞান পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কালিদাস পূর্বসূরীকে অতিক্রম করেছেন : যক্ষের অভিজ্ঞানে কবিত্বগুণ অনেক বেশি। (বাল্মীকি-রামায়ণ : রা. বসুর অনুবাদ : সুন্দরকাণ্ড দ্র.)

৪৩। 'লোকের কথা' : মূলে কৌলীন : লোকপ্রবাদ, gossip। 'না যেন দেখা দেয় অবিশ্বাস' : আমার মৃত্যু আশঙ্কা কোরো না, বা বিরহে আমার প্রেম নিবৃত্ত হয়েছে ভেবো না। শ্লোকের প্রথম পংক্তি প্রথম অর্থের এবং শেষ দুই পংক্তি দ্বিতীয় অর্থের পরিপোষক। দুই অর্থই ধ্বনিত হবার বাধা নেই। (আমার চরিত্রদোষ আশঙ্কা কোরো না, এই অর্থও বিবেচ্য।)

৪৪। সংস্কৃতে 'স্নেহ' ও 'প্রেম'-এর সমার্থক ব্যবহারে বাধা ছিলো না, পূর্বমেঘ ৪৪-এ 'পুত্রস্নেহ' অর্থে 'পুত্রপ্রেম' আছে। কিন্তু এখানে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট ; অসহ বিচ্ছেদের প্রভাবে স্নেহ প্রেমরাশিতে পরিণত হ'লো। মল্লিনাথ 'রসাকর' থেকে সংযোগ বা মিলিত প্রেমের সাতটি পর্যায় তুলে দিয়েছেন : আলোকন (চোখে দেখা), অভিলাষ, রাগ (কামনা বা মিলনেচ্ছা) স্নেহ, প্রেম, রতি ও শৃঙ্গার। এই ক্রমানুসারে প্রেমের বিশেষ অর্থ :

১১৪

সখীরে দেবে তুমি এ-মতো আশ্বাস, প্রথম বিরহে সে তাপিতা,
ত্বরায় ফিরে এসো সে-গিরি থেকে, যার শৃঙ্গ হরবৃষখনিত,
পাঠাবে প্রিয়া তার কুশল-সমাচার, এনো অভিজ্ঞান[৪৫] সঙ্গে—
প্রভাতকুন্দের মতোই স্খলমান আমার জীবনেও রক্ষা করো।

১১৫

সৌম্য, হবে তুমি আমার বান্ধব ? আছো কি সম্মত কার্যে ?
নিরুত্তর যদি, তবুও সংশয় করি না আপনার স্বভাবে ;[৪৬]
যাচিত হ'লে পরে চাতকে জলদান, তাও তো করো নিঃশব্দে—
কেননা প্রার্থীর বাঞ্ছাপূরণেই মহৎজন দেন উত্তর।

১১৬

বিধুর আমি, তাই, অথবা করুণায়, কিংবা বন্ধুতাবশত,
জলদ, করো তুমি আমার প্রিয় কাজ, মিটাও অনুচিত[৪৭] যাচনা ;
প্রাবৃটে দেশে-দেশে ঋদ্ধিশালী হ'য়ে বিহার কোরো তুমি তারপর—
কখনো না ঘটুক তোমার বিদ্যুৎ-প্রিয়ার ক্ষণেকের বিচ্ছেদ।[৪৮]

যে-অবস্থায় বিচ্ছেদ অসহনীয়। লক্ষ্যণীয়, ৯৫ শ্লোকে যক্ষপত্নীর প্রসঙ্গে 'স্নেহ' শব্দের ব্যবহার আছে, তার মন পতির প্রতি 'সম্ভৃতস্নেহ'। (সম্ভৃত=বর্ধিত) দুটি শ্লোক পাশাপাশি পড়লে ভাবা যেতে পারে যে, বিরহে উভয়েরই 'স্নেহ' বর্ধিত হ'লেও পত্নীর মনে তা 'প্রেমে' পরিণত হয়নি, যক্ষ বলতে চায় দু-জনের মধ্যে সে বেশি ভালোবাসে।

৪৫। যক্ষের মতো, তার পত্নীও মেঘের মুখে কোনো অভিজ্ঞান পাঠাবে, তাতে যক্ষ বুঝবে মেঘ কর্তব্যে ত্রুটি করেনি।

৪৬। 'স্বভাবে' : অনেক ভেবে এই শব্দটি লিখলাম। মূলে আছে 'ধীরতা' (গম্ভীরতা, নির্ভরযোগ্যতা) ; যক্ষ বলছে, 'প্রত্যুত্তর পেয়েই আপনার ধীরতা অনুমান করবো তা নয়', অর্থাৎ, উত্তর না-পেলেও বুঝে নেবো আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন। (এই পংক্তিতে যক্ষ মেঘকে আবার 'আপনি' বলছে।)

শ্লোকের শেষার্ধ বিষয়ে মল্লিনাথের টীকা : শরতের মেঘ গর্জন করে বর্ষণ করে না, বর্ষার মেঘ বিনা গর্জনেও বর্ষণ করে। নীচজন কথা বলে কাজ করে না, সুজন কথা না-ব'লে কাজ করে। চাতক জল চাইলে বর্ষার মেঘ নিঃশব্দেই জল দেয়, তেমনি যক্ষের প্রার্থনাও সে পূরণ করবে। অর্থাৎ পরোপকার করা মেঘের স্বভাব।

৪৭। যক্ষ জানে তার অনুরোধ অনুচিত ; জড় মেঘ বার্তাবহ হ'তে পারে না। পূর্বমেঘ, ৫ তুলনীয়।

৪৮। মল্লিনাথ 'সারস্বতালংকার' উদ্ধৃত করেছেন : 'কাব্যের অন্তে নায়কের ইচ্ছার অনুরূপ সর্বজনের প্রতি প্রয়োগ্য একটি আশীর্বাদ উচ্চারণীয়।' প্রিয়ার সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ না ঘটুক— কবি এই শুভকামনা পাঠককেও জানাচ্ছেন।

মালার্মে : প্রগতি

বিষ্ণু দে

মালার্মে ! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট্ বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর ;
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে, স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, স্বরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর কষায় ;
তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দ যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য ; খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে
পাস্টেরনাকের দেশে ঊর্ধ্বশ্বাস কালের বাতাসে
নবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি ॥

সুন্দরের গাথা

শামসুর রাহমান

যেখানে সূর্যের তলে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা
নিসর্গে মধুর মতো, ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে
অথবা যেখানে গাঢ় চন্দ্রবোড়া সঙ্গিনীর শাখায় আকুল,
ঋতুর মধুর রণে পরাক্রান্ত, সেখানে আমার অভিলাষ
অভিসারী। পিছনে থাকুক প'ড়ে অনেক দূরের
অনন্ত তারার মতো লোকালয়, তাকাবো না ফিরে।

যে-চেতনা ভ্রমরকে মেখে দেয় ফুলের যৌবনে,
বসন্তের তরুণ গাছকে
দেয় মেলে অনাঘ্রাত নীলের আকাশে,
সমুদ্রের ঢেউয়ে আনে পাখিদের উদ্বেলিত বুক,
নিঃসঙ্গ কবিকে দেয় জীবনের গাঢ় মদ— শব্দের প্রাসাদ,
যে-চেতনা তৃষ্ণার্ত যাত্রীকে আনে ফের
স্মৃতির সৌগন্ধ্যে ভরা শীতল ঝর্নায়,
তারই প্রজ্বলনে
সমস্ত দুপুর ভ'রে জলের আলোর নিচে দেখলাম তাকে :
সঞ্চারিণী জলজ উদ্ভিদ যেন। এবং স্ফুরিত
অধরে রক্তিম মাছ, ফলের পূর্ণতা তার সমস্ত শরীরে।

সহসা উঠলো ভেসে গভীর জলের সেই নারী
এবং সহজে তার করতলগত
নন্দিত ফুলের ঝাড় দিলো সে বাড়িয়ে
আমার চোখের নিচে। দুর্লভ মণির মতো স্তন
ঘন হ'লো বাসনার তাপে, যেমন গ্রীষ্মের ফল
গাঢ় হয় সূর্যের চুম্বনে। দেখলাম জনহীন তীরে সব

উৎকণ্ঠা উজিয়ে এসে প্রবীণ কচ্ছপ অকাতরে
তাপ নিলো খুঁজে তার রৌদ্রের মসৃণ বালাপোষে।

সূর্যের জাহাজডুবি হ'লে সে-নারীকে বললাম,
'আমার জীবনে তুমি খেয়াল-খুশির ঝরনায়
প্রতিদিন যে-কুসুম দিয়েছো ছড়িয়ে,
সুতীব্র আনন্দে তার গড়েছি বাগান, লোকোত্তর।
আমার ত্বকের নিচে অলৌকিক যে-কীট খেলায়
সারাক্ষণ মগ্ন তাকে ভুলে গিয়ে চেয়েছি তোমাকে,
যেমন মৃত্তিকা চায় সজীব গাছের ফল, সুপক্ক-সোনালি।'

ভেবেছি বিঁধবো তাকে সহসা কৌশলে, অথচ সে
নিরুত্তর অধরে রক্তিম মাছ নিয়ে
স্বপ্নের চেয়েও আরো অধিক অতলে
গেলো ডুবে নবতর কেলির তৃষ্ণায়।

তখন রাত্রির পূর্ণ আকাশে হঠাৎ এলো চাঁদ—
অমূল্য, অপ্রাপণীয় মুক্তো। আর একটি শুয়োর
ইতস্তত পথ শুঁকে এসে গেলো জ্যোৎস্নায়, যেখানে
তারার বুদ্বুদে ফোটে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা।

মুছে গেলো দৃশ্যাবলী চারদিকে, অনন্তর একা
আমি আর অকূল শূন্যতা॥

তিনটি কবিতা

মৃণালকান্তি

একটি পাখি

মাটির খাঁচায় বন্দী পাখি
উদাস চেয়ে থাকে,
রোদ বৃষ্টি ক্লান্ত দিন ঝরে—
কে দূর থেকে ডাকে।
সইতে যে হয় অর্থহীন
অনেক দুর্ভাবনা—
কী দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালা
বাঁচার দাহ দেনা।
কালের কশায় জীর্ণ খাঁচা
হঠাৎ ভেঙে পড়ে,
চেনা আলোর আকাশ ছেড়ে
পাখিও যায় উড়ে॥

প্রেমিকের গান

সে এক অলীক স্বপ্ন—তবে তার তরে,
কেন বলো এত কথা, এত গান ঝরে?
দিনের মুখর নীড়ে রৌদ্রের মতন,
সে-মধুর ভাবনায় ভ'রে থাকে মন।
একাকী আঁধার ঘরে দীপশিখা জ্বলে,
দেয়ালে শূন্যতা কাঁপে, চোখ ভরে জলে।
সোনায় সংসার মোড়া তবু নেই সুখ,
কেন একা অন্ধকারে কেঁদে ওঠে বুক।

দিন রাত মনে-মনে চাই যেন কাকে,
ঘুম ভেঙে জেগে উঠি কার দূর ডাকে—
চেনার ভুবনে নয় ; মন তাকে জানে,
সে-রূপে জীবন রাঙে, প্রাণ ঝুরে গানে ॥

অন্বেষণ

সেই দীপ আকাশ-অঙ্গনে জ্বলে, ফুরায় না কভু যার আলো।
সে-অনামা পুষ্প থেকে ছড়ায় সুরভি, পাপড়ি ঝরে না এলোমেলো।
সে-চাঁদের নেই বাড়া-কমা, চির রাত্রি ঢালে শুধু পূর্ণিমার সুধা।
সে-জীবন আপন আনন্দে পূর্ণ, নেই তার কোনো তৃষ্ণা ক্ষুধা।
সে-সিন্ধুপাখির কণ্ঠে গান অবিরল, মানুষের বুকে তার বাসা।
সে অদৃশ্য মহানদী নিরবধি বহে, অমৃতের মিটায় পিপাসা।
সে-রামধনুর রং মোছে নাকো মেঘে, রাঙায় আকাশ চিরদিন।
সে-অগ্নির আলো থেকে জ্বলে কোটি প্রাণ,
দীপ্তশিখা জাগে মৃত্যুহীন।—
রৌদ্র বৃষ্টি ধূলি ঝড়ে অনির্ণীত পথহীন দূর দিক-দেশে,
উদয়াস্ত ফিরি আমি স্বপ্নচারী, সেই মহাপ্রাণের উদ্দেশে ॥

জলছবি

রাজলক্ষ্মী দেবী

আলো-ঝলমল প্রজাপতি-বনে আমি।
লাল ভোরে তুমি শাল-গায়ে চলো আগে,
খোয়াইয়ের পথে পায়ে-পায়ে চলি, থামি।
উজ্জ্বল সব জলছবি ভালো লাগে।

যন্ত্রণা নিতে ডাক দেবে সেই,—ফাঁকি
—মন্ত্রে পালাবো আরো দূর, ঢের দূরে।
স্বেদ নেই, আহা, ছেদ নেই, জানো না কি ?
—মনের আকাশ লেপে গেছে রোদ্দুরে।

উড়াল হাওয়ায় আলুথালু চুলে আমি।
কৃষ্ণচূড়ায় ফুলের পতাকা ওড়ে।
আল্‌পথে ভারি টাল খেয়ে উঠি নামি,
তবু জোরে চলো, গাড়ি, চলো আরো জোরে।

তেমনি অনেক প্রবল বেগের সুখে
পুতুল-প্রেয়সী বসবো তোমার পাশে,
তাকাবো আবার সেদিনের সেই মুখে,
—কী জানি কী পেয়ে মন তাকে ভালোবাসে।

আবার আষাঢ়ে জল-ঝরা রোদে আমি।
শালের গুঁড়িতে বসেছি একলা, একা।
মুহূর্ত কাটা-হীরের মতন দামি,—
কখনো সহসা পাবোই তোমার দেখা।

ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে পাল-তোলা খুশি বেয়ে
তারপরে আমি ছুঁতে যাবো কোন তীর !
আহ্লাদি রোদে আচমকা মদ খেয়ে
হাসিতে খুশিতে হয়ে যাবো চৌচির !

কানারীয়

[লা পামাস্ দ্বীপ থেকে ফেরার পথে]

শান্তিকুমার ঘোষ

উঁচু-ঢেউ নিচু-ঢেউ পাহাড়ের সারি :
য়ুকালিপ্‌টাস ঘন ছায়া উষ্ণ সুখ কানারীয় গীত।
ওখানে জমাট ফেনা তু'ত-গলা স্বপ্নে স্থির জল,
ঘুমন্ত বিরাট মুখ প্রাচীন লাভায় ঘেরা বিন্দু পল্লীখেত ;
অগাধ বিস্তৃত শান্তি ছুঁয়েছে আকাশ-শীর্ষ উপত্যকা ঢেকে।

লতার আড়ালে মুখ রেশম-ওড়না-লঘু রৌদ্র-হাসি দ্রাক্ষানীল চোখ—
হে বিদেশী, থামো থামো···চকিত ইশারা :

পুষ্পিত পথের প্রান্তে অদৃশ্য সমস্ত ধন আরক্ত ব্যথায়।

তিনটি কবিতা

দেয়ালটা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বোবা দেয়ালটা শাদা দেয়ালটা
হঠাৎ লালচে,
রঙ্গনটিনী ভ্রমরার কাছে
আদর কাড়ছে।

বোবা দেয়ালটা শাদা দেয়ালটা
রঙ্গনটীর পায়ে মাথা কোটে,
রঙ্গনটীর পায়ের আলতা
লাগে নীরক্ত মুখে আর ঠোঁটে :

এতদিন পরে ও কিছু বলছে :
'এই যে রক্ত এই অলক্ত
আমার কঠিন পাঁজরে জলছে
তার দাবি বড়ো ভীষণ শক্ত।

এই যে আমার শরীরে অধরে
স্বাক্ষর দিলি, তোর পায়ে প'ড়ে
ভেঙে যাই যদি, তবু বল ওরে
ভ্রমরা, পালিয়ে যেতে পারবি তো ?'

আমি তো পঙ্গু, নিশ্চল বোবা
আমি যদি হই তোর মনোনীত
কোন করবীতে আমি তোর খোঁপা

সাজিয়ে করবো আরো মনোলোভা—
বঁধুয়া, তখন তুই কার মিতা ?
ভ্রমরা তবুও নিশ্চুপ, তবু চিত্রার্পিতা ॥

পান্থশালা : নীলকণ্ঠপুর

এখুনি লণ্ঠন জ্বলবে। নিভবে রোদ্দুর।
দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি আকাশ
বুকে নিয়ে আমি আর নীলকণ্ঠপুর।

এই মুহূর্তের আমি অন্ধ ক্রীতদাস
নিরুপায় নিরালায় দেখে যাবো আমি
দুই পাহাড়ের খাদে সূর্য মৃত্যুগামী।

অথচ লণ্ঠন জ্বলবে। মৃত্যু কত দামি ?
মৃত্যু, ছাখ প্রদোষের নীলকণ্ঠপুর
একটি জোনাকি, এক ইউক্যালিপ্টাস ॥

নতুন

ও-রকম ক'রে কথা ঘোরাস না পাখি
রাত্রি এখন মূর্ছিত হ'য়ে আছে,
ফিরিয়ে যখন দিয়েছিলি, সেই স্মৃতি
বুকে ক'রে ও যে ম'রে গিয়ে যেন বাঁচে !

বৃথা হ'লো তোর মালতীর ডালে-ডালে
পাতায়-পাতায় কথা ঘোরানোর রীতি।
নতুন প্রণয়ী এলো ঐ মায়াজালে :
শেষরাত্রির আঙুলে রক্তরাখি ॥

প্রথম দেখা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যেন দুপুরের ঘুমের পর সন্ধেবেলায় উঠলো নারী, ধীরে-ধীরে,
ফোলা-ফোলা চোখে, শিথিল আলস্যে ; ঈষৎ মুক্ত
রঙিন ঠোঁটের ভিতরে লোনা জিহ্বা যেন
তার অকাতর, অলজ্জ, অসংকোচ আমন্ত্রণ।
পাতলা ধোঁয়ার
কুণ্ডলী ছাপিয়ে ঐ নারীর মতো উঠলো চাঁদ, মগ্ন
করলো নিজেকে সোনালি উন্মীলনের গূঢ়
অন্তঃপুরে, আর তার শাদা, নির্দোষ, অনাবিল
আবির্ভাব আমাকে উন্মুখ করলো আমারই
পাশের দিগন্তছাড়ানো আকাশে ; দেখি,
এক তন্বী রূপসী,— জানতেম না যে তাকে ভালোবাসি,—
কোথায় যাবে যেন, তাই পথ চলছে, আর
তার দোদুল চলমান রূপ তখনই রক্তাক্ত করলো আমার
হৃদয় ;

সারা রাত তার পিছু-পিছু ব'লে বেড়ালাম করুণ গলায়, না,
যেয়ো না, আমাকে ছেড়ে চ'লে যেয়ো না ॥

সনেট

অর্চন দাশগুপ্ত

এ-রাতের আঁকাবাঁকা কবোষ্ণ শিরায়
কালো রক্ত নেমে এলো আদিম কাফ্রির,
আর তুমি নেমে এলে এই কবিতায়
ক্যানা-র মসৃণ গালে শিশিরের মতো।

আমিও ভেবেছি কতো তোমার স্নায়ুর
সোনালি শিকড়ে মিশে ব'য়ে যাবো, আর
এ-রক্তিম বাবেল-এর ভাষার দাঙ্গায়
জন্ম হবে কোনো এক এস্‌পারেন্তো-র।

তা ছাড়াও কোনো এক চতুষ্কোণ ক্ষণে
চোখের এ-জল হবে তারার সংগীত
এবং কখনো তুমি আহ্নিক শূন্যকে
আশ্চর্য আগুন জেলে সংখ্যা ক'রে দেবে।

কিন্তু কি তোমার বেদ তিনটি চিঠিতে
শেষ হ'লো? তারপর সব চুপচাপ॥

বস্তুত অরণ্য আমি

সৈয়দ শামসুল হক

"I am indeed as a forest and as a shade of sombre trees....."
—Nietzsche

আমি এক অন্ধকার অরণ্যের মতো
দীর্ঘ, ঋজু, সুপ্রচুর, বিশাল, বিস্তৃত;
মূল কন্দ দৃঢ় কাণ্ড লতা,
জন্তু, কালো, সবুজের সচ্ছলতা
নিয়ে আছি; কিন্তু আছে হতভাগ্য শ্বাপদের শব
ইতস্তত অনিবার্য; এ-অরণ্য অনন্ত অরব—
সর্বোপরি সংগীতের ক্ষীণ মূর্ছনা
এবং সম্পূর্ণ আমি, জানি সান্ত্বনা।

আসতে চাও এসো, কিন্তু মৃত্যুভয়
তীব্র হোক, নষ্ট ক'রে দিক সে-হৃদয়।

গভীর রহস্য কত, জানতে যদি—
তৃষ্ণার সময়ে জলে স্বচ্ছতোয়া নদী
লুপ্ত যার স্রোতাবলী অল্পকাল পরে:
পাতা প'ড়ে কুলো হয় সেই বনে সহস্র বিবরে
দুর্লভ হীরক এক, রত্নমণি, মসৃণ হরিণী
এবং সেখানে কাঁদে লোকশ্রুত শাপভ্রষ্ট মুনি;
জানতে যদি কিছু তার শ্লোক, হরিণী চীৎকার,
কখনো রত্নের খোঁজে তুচ্ছ কার রমণী, সংসার!

জানতে চাও জেনো, কিন্তু উপবাস
দীর্ঘ হোক, নষ্ট ক'রে দিক সে-উল্লাস।

২

এবং বসন্ত নামে কোনো-কোনো রাত্তিরের ছলে
তখন বিরাট হয়, যাকে বলো চাঁদ—ক্রমে জলে
সারারাত, আর অন্ধকার
যেন তাড়া খেয়ে এক হলদে কিংবা ধূসর চিতার
অসহায় গোঙানিতে—মুগ্ধ বাতাসেরা—অপহৃত ;
ধ্বনির ক্রন্দন শূন্যে ক্রমে নিঃশেষিত
চার প্রহরের দূরে। এবং হরিণী
অকস্মাৎ সুগন্ধ বিস্তৃত করে স্বয়ং, মোহিনী,
বিস্ময়ে বিমূঢ় থাকে।
কিন্তু সে একেলা
সেই অতিমানুষের মন, জানি, ডোবে তার দর্শনের ভেলা
আপনারই ঘূর্ণাবর্তে ; সারাৎসার পান ক'রে নীল-
কণ্ঠ কে কবে হয়েছে বলো ?—কিন্তু ঝিলমিল
পাতা ও জ্যোৎস্নার মানে, অর্থাৎ জীবন,
সহসা প্রমুক্ত হ'য়ে একেক মুহূর্তে করে গাঢ় উচ্চারণ
বিশ্বাসের শান্ত উপচারে।
এবং সে ক্ষুদ্র কত—বিদ্ধ করে তাকে বারে-বারে
এ-যন্ত্রণা—প্রেম, স্বর্গ, বিশ্বাসের দ্বার
অনন্তে প্রোথিত ; সে নিজেই নিজের শিকার।

জানতে চাও তবু, জেনো, কিন্তু প্রেম প্রেমের বিশ্বাস
শুভ্র হোক, নষ্ট ক'রে দিক সে-উল্লাস ॥

লগ্ন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

না, না। তোমাকে তো নয়। জনারণ্যে বিভ্রান্ত বিক্ষেপে
ধুলোয় স্বেদাক্ত স্বাদে শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ সম্পাতে
যে-যাত্রা অন্ধের মতো প্রত্যহের ধাবমান স্রোতে—
সেখানে তোমাকে নয়। হা-হা স্বরে হাওয়ার আক্ষেপে
এ-জগতে প্রত্যাশা স্থবির।

প্রাণভয়ে আনো ক্ষীণ
শাল্মলীর শীর্ণ ছায়া, অশ্বত্থের উদ্দীপনাহীন
দুঃস্থ দীর্ঘশ্বাস। দুঃস্বপ্নে বিদীর্ণ রাত্রি দ্বিধান্বিত,
দিনের রাতের স্নায়ু অন্ধকারে বিদ্বেষকঠিন ;
এইখানে ভুলেও এসো না।

অন্তরালে কঠিন নিশানা।
সময়ের ইন্দ্রজালে প্রান্তর আকাশ
পূর্ণ করে, জাদুদণ্ডে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে জড়ায় চেতনা ;
ছড়ায় ভ্রান্তির বেগে মাঠে, নীলে নিষ্ঠুর সন্ত্রাস
দুই হাতে। এখানে এসো না।

প্রণয়ের আকর্ষণে
প্রহরাপীড়িত চোখ মুক্তি খোঁজে প্রথম চুম্বনে,
বুদ্ধিহীন ক্ষণিক দীপ্তিতে। আজ সে উদ্যম থাক,
জগদ্দল পাষাণের ভার বুকে পৃথিবী নির্বাক ;
সুপ্তিহীন। এখন এসো না।

আজ মনে পড়ে
শ্রাবণমেঘের সেই গুরুগুরু ধ্বনি। দিকে-দিকে
সর্বত্রই ছড়ানো স্মরণ ; সর্বত্র নিহিত মর্মমূলে
চ্যুত পল্লবের স্মৃতি,—বিজয়ে বিষাদে অনিমিখে
অমিত বীর্যের অন্বেষণ।

সময়ের জাদুঘরে
কঙ্কালের স্তূপ স্তরে-স্তরে ; প্রণয় বিচ্যুত হ'য়ে
জীবনের মায়াপুরে যতো শব কালিমায় ক্ষয়ে
স্তূপায়িত, বিনষ্ট সংহতি। বসন্ত যদিও ঝরে
সে তো শুধু ছদ্মবেশ,— এইখানে এখন এসো না ॥

ছত্তিশগড়ের লোক-সংগীত

[ভেরিয়র এলউইন-এর ইংরেজি থেকে]

বিকাশ দাশ

১

ছেলে :

কমলালেবু আনতে যেতাম
হ্রদের পারে,
কিন্তু ভয়, পিছলে পড়ে
ডুববো জলে।

মেয়ে :

আমিও যেতাম আনতে কলা
হ্রদের ধারে,
কেবল ভয়, পিছলে গিয়ে
ডুববো ব'লে !

২

কুকুর যখন ডাকল গাঁয়ে
ছিলাম মশগুল
স্বপ্নে ; যখন ভাঙল ঘুম, কিছুই নেই, শুধু
রাত্রি করে ধূ ধূ।
তবুও জানো বাতাসে পাই তোমার গায়ের ঘ্রাণ।

৩

ওরে বন্ধু, তাকে ছাড়া বাঁচব না রে আর—
বাঁচব না রে,— বাঁচব না রে আর !
পরো তোমার কুসুম-রঙা শাড়ি
ঝলমলাক রং-বাহারি পাড়।

ঝুলনে আমি ঝুলব ব'সে-ব'সে,
ফাগুন এলো—ফাগুন এলো আজ!

গাইব গান চলো,
ঢোলকে বোল, মধুর বোল তোলো!
স্বামীর ঘরে অঝোরে কেঁদে-কেঁদে
প্রেয়সী গেল কুশী নদীর ধার।
তাকে ছাড়া বাঁচব না রে আর।
ওরে বন্ধু, বাঁচব না রে আর।

৪

মহুয়া ফুল কুড়োবে নাকি, মেয়ে?
এসো তবে, সঙ্গে আমার এসো।
তেঁতুল কাঁচা, জামগুলো সব কালো,
কলার ঝাড়ে থোকায়-থোকায় কলা।
মহুয়া ফুল কুড়োতে যাবে নাকি?
এসো, আমার সঙ্গে তবে এসো।

৫

আংটি, বালা, রুপোর মল
চাইতে পেলো মেয়ে,
পেলো আরো ঝকঝকে কঙ্কণ।
তুমিও যদি চাইতে, পেতে, রাজা,—
ও-মেয়েটির সোনার যৌবন।

৬

কুড়িয়ে গোবর ঘুঁটে দিতেই গেল
সময় আমার, নামল রাত, রাজা।
রাখো আমায় সঙ্গে তোমার রাখো।

কাঠ কাটতে গিয়েছিলাম বনে,
আঁটি বেঁধে ঘরে ফেরার পথে—
নামল রাত, রাজা।
রাখো আমায়, এবার রাজা, রাখো
পায়ে পড়ি, ক্ষমা করো, রাজা
রাখো আমায়, সঙ্গে তোমার রাখো।

৭

হরিণীর কাছে হরিণ এসেছে একা।
আমার প্রেয়সী খোঁপায় গেঁথেছে ফুল,—
সে-ফুলগন্ধে পথের বাতাস হ'লো আকুল

না মিলুক নাম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

না মিলুক নাম,
তোমার নিমীল চোখে তবু সেই আগুন উদ্দাম
প্রকাশের প্রতীক্ষায় দেখেছি কোরক।
না মিলুক, এ যে সেই চোখ,
চিনেছি। আবিষ্ট ওই নিশির নূপুর
কেন শ্লথ হ'য়ে আসে, কেন ওই তামসী বধূর
চরণে সহসা আসে দ্বিধা!

শুধুই কি সত্য ওই প্রাথমিক দেহের অভিধা?
শুধুই কি মোহদ্যুতি অগ্নিরূপ দেখে
বিকচ নলিনীদলে অলি জোটে ক্ষণেকে ক্ষণেকে?
মর্মরিত নিশিতলে যার
বার্তা রটে, তা কি শুধু স্তুতগী শ্যামার
একান্ত ভঙ্গুর দেহখানি?

মেলেনি পারানি,
অন্ধকার নদীজল তাই আরও রূঢ় অন্ধকারে
নিরুদ্দেশ রেখেছিল আপনার বধির সত্তারে।
সহসা কী সচকিত স্বরে
সম্বিৎ ফিরায়ে দেখি তখনও সুদূরে
বসন্তের ফুলবনে ঘুরে মরে অনঙ্গ নিষাদ!
অমর তূণীরে তার গান্ধর্বের সনাতন স্বাদ,
অব্যর্থ সায়কে
উত্তরঙ্গ সপ্তসিন্ধু আজও ফেরে ধ্রুব স্বপ্নলোকে:
যেখানে আকাশ
আনীল মৃত্যুর মাঝে উজ্জীবিত আজও বারোমাস॥

সেদিন নওল সন্ধ্যা, নভতল উদাস পূরবী;
মন্দগতি হাওয়ার সুরভি
নিদ্রালু পিয়ালকুঞ্জে দিগন্তের প্রিয়বার্তা আনে।
কিসের সন্ধানে
অঙ্গনে দাঁড়ালো এসে শীর্ণতনু চাঁদ,—
কম্পিত অধরে তার মদিরার অবোধ আহ্লাদ
ভেসে এল দূরান্ত ধরায়
দুরন্ত ধারায়,
ভাসালো সে নদীবন অশান্ত আবেশে।
মনের বিস্তৃত মহাদেশে
জানি না কী গূঢ় মন্ত্রে দাঁড়ালো যে উঠে আচম্বিতে
অকম্প্র শিখার স্থৈর্যে আপনার পরিচয় দিতে,
তার পরিচয়
সংকেতের মৌনে তা কি সমুজ্জ্বল নয়?

না মিলুক নাম,
তোমার নিমীল চোখে তবু সেই আগুন উদ্দাম
পতঙ্গের মুক্তি যে আগুনে!
না থাক অর্ঘ্যের ডালি উদ্ভাসিত উজাড় ফাল্গুনে,
না থাক মন্ত্রের ধ্যান উৎকীর্ণ আলোকে,—
আমার বেদনবাণী লেখা আছে দুটি মুগ্ধ শ্লোকে,
রহস্যের বিনীত বন্দনা।
অয়ি সুলগনা,
যে-লগ্নের লিপি পণ্য ক'রে
এইমাত্র সপ্তডিঙা ভেসেছে সাগরে,
শুধু সেই মুহূর্তে অন্তত
আমাকে ঘুমাতে দাও গহন বিস্ময়ে চন্দ্রাহত!

জলছবি

প্রতিমা পাল

সূর্যের চন্দন-টিপ মেঘের কপালে,
ভোরের আকাশ সাজে সোনালি সবুজে,
শিশিরের স্বচ্ছ রং বাতাসের নীলে
ঝুমকোলতায় ঘেরা চাঁদের গম্বুজে।

ভোরের সমুদ্র যেন স্তব্ধ মায়াবিনী
হিংস্র চিতার মতো লুব্ধ লালসায়
দিনের কঠিন দেহে উচ্ছ্বাস জাগায়
তারার নখরে ছেঁড়ে কামনা-হরিণী।

ভোরের অরণ্যে জাগে সোনালি শকুন
বঞ্চিত রাত্রির পাখি মৃত্যুর তুষারে
হিম হ'য়ে আসে ; বিপ্রলব্ধ সকরুণ
ডালিম-রোদের মুখে লাল অশ্রু ঝরে।

জলছবি-রং ভোরে করুণ যন্ত্রণা
সূর্যের একক চোখে মুখর সান্ত্বনা।

কাণ্ডাঘাট স্টেশনে ভোর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

গৌরীবধূ আকাশে যাবে না
আলোকলতা কুণ্ঠাময়ী ভোরে,
ছিন্ন ক'রে ছড়িয়ে দিল তাকে
মহেশ্বর-বাহুর অভিমান।

*　　*　　*

এপাশে বুঝি কুড়চি ফুল ফোটে
ওপারে চাপা কান্না গুরুগুরু,
পৃথিবীময় শান্ত ভোর নামে—
তবুও কারা শুনেছে ডম্বরু।

পুনশ্চ

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুগৃহে পাঠশেষে কেউ গেছে মহুয়া কুড়োতে,
রাখাল পিতৃব্য কারো, তাই তাকে যেতে হ'লো মাঠে
কাঠুরিয়া একজন গেল জলে শরীর জুড়োতে
অন্যান্য অনেকে আজো অকারণ পথে-পথে হাঁটে ;

সেই পথে ছায়ারঙ্গ, অরণ্য কোথাও জেগে আছে,
খরস্রোতা নদী কিংবা উঁচুনিচু উপত্যকা জলা,
অন্ধকার ভয়ংকর হিংস্র কত শ্বাপদের কাছে
সমর্পিত দেহ, প্রাণ মূর্ছাহত কেবল উতলা ;

মন শুধু সঙ্গে আছে, আর তার মৌন জাদুকরী
প্রভাবে বাঁশিতে কেউ হৃদয়ের সব দেয় ডালি,
রুদ্ধদ্বার নগরের পথে-পথে সতর্ক প্রহরী—
শ্রোতৃবৃন্দ ব্যঙ্গভরে দিতে পারে তীব্র করতালি ;
আমি হাঁটি, হাঁটি কেন, জানি আমি বহু পথ বাকি
যার সঙ্গে দেখা হ'লো সে আবার দেখা দেবে নাকি !

নীল চিঠি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ দিয়ে অন্তহীন আকাশের মন
কতোটুকু ভরা যায় ? কতোটুকু স্নায়ুর কম্পন
সওয়া যায়— অনিদ্রায় রাত ভোর পাশের বালিশে।
সাবলীল নীল চিঠি। মুছে ছায় চোখের কালি সে
কতোটুকু ! মা তাকে আড়ালে ডাকে, দিদির চোখের
অপলক আক্রমণ, দাদাটির উদ্ভট শ্লোকের
বিশ্লেষণ— সব তাকে শুনতে হয়, গুনতে হয় দিন—
মাস-বছরের কোঠা। টিকটিকিটা চিন্তাভারহীন
দেয়ালে সাঁতার ছায়, নেই তার পতনের ভয়।

কুমোরে পোকার হাতে আরশোলা কাঁচপোকা হয়।

জারুলের, শিরীষের ডালে ফুল ; গুলমোরের পাতা ;
সব-কিছু ভুলে থাকে, অপঠিত পরীক্ষার খাতা ;
ভরে না মনের শূন্য কলসি, মোছে না ঝুলকালি।
বোন ব'লে, 'এমনি ক'রে কতদিন দিবি জোড়াতালি ?'
নিটোল, কোমল দুটি স্তনের ঘনত্বে লীন তার
নীল চিঠি— গান গায় অনাগত একটি তারার।
সদ্য স্নান-সারা দেহে মুখর আলোরা নেমে আসে ;

ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘগুলো রাঙা হয় সন্ধ্যার আকাশে।

চক্রবৎ

শোভন সোম

বন্ধুরা সবাই দূরে-দূরে ;
বৎসরান্তে দেখা ঘুরে-ঘুরে
কথনো হয় না নিয়মিত।

সবার কাছেই আমন্ত্রিত
আমি, আর প্রত্যেকেই তা-ই—
কেবলই চিঠির পাতা ভ'রে
ভ্রমণের খসড়া বানাই—

—'এখানে মার্বেল রক'— কেউ
—'জ্যোৎস্না রাত্রে সমুদ্রের ঢেউ'—
—'তুমি নাকি দ্যাখোনি কুতুব !'—
—'চাচাই প্রপাত দেখে যাও'—

অথচ, চিঠির জমে স্তূপ
ঘুঁটি বাঁধা সবার জীবন,
মনে-মনে অচ্ছেদ্য বন্ধন—

যদিও নড়ি না এক পা-ও
বৎসরান্তে একই আমন্ত্রণ ॥

দুটি কবিতা

দুই তীর

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
শেষ-সূর্যের আবীর জড়ানো পাড়ে ;
ঐরাবতেরা শুঁড় তুলে চারধারে
সহসা ছড়ায় ঊর্ধ্বে ঘন তিমির।

শান্ত বিকেলে এ কী প্রমত্ত ঝড় !
ব্যাকুল আকাশে ত্রস্ত পাখিরা ফেরে—
সাঁওতাল মেয়ে দল বেঁধে কাজ সেরে
দ্রুত পায়ে চলে, পারুলডাঙায় ঘর।

বারে বারে তুমি জীবনে ছড়াও ভয়
তবুও সন্ধ্যা, তবু যে নীড়ের টান—
হৃদয়ের ঝড়ে নেই কি পরিত্রাণ
শেষ-সূর্যের স্তম্ভিত বিস্ময় ?

আকাশে বিকেলে উঠেছে দুই শিবির
দ্বিধা-কম্পিত হৃদয়ের দুই তীর।

গৌরী

রোদের উচ্ছ্বাস মুছে
শেষ আভা হাসিতে ছড়িয়ে
কাঞ্চন-বরনী তুমি এলে।

রোদের গন্ধের রেশ তোমার শরীরে
চোখে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার প্রদীপ।

ছড়ালে সুরের জাল
ক্লান্তি মুছে ঝরল বকুল,
মনের আকাশ ভ'রে
গন্ধ হয়ে গান এল ভেসে

তারা-ভরা রাতের বাতাসে।

জরাসন্ধ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হল পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, কৃপণ জলে তেচোকো মাছের আঁশ গন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি? আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে গাহনে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।

তবে হয়ত মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার হয়ে আছি, অন্ধকার থাকবো এবং অন্ধকার হব।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে॥

বৃষ্টির সখ্য

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ছুটতে-ছুটতে এসেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

বাইরে সে এতক্ষণ দাউদাউ ক'রে জ্বলছিল
রোদ্দুরে।
মমতায় উদ্বেল দুটি চেনা চোখের কাছে এসে
ধ্বসে পড়ল যেন ভাঙাচোরা পোড়ামাটির পুতুল—
জ্যৈষ্ঠের কুঠারে মাঠের মতো চেরা দাগ সারা গায়ে।

তারপর হাড়গোড়-বের-করা আর ছাল-ওঠা
দুমড়োনো পেয়ারা গাছের মতো ঝুঁকে দাঁড়ালো
পাতাশূন্য।
শিকড়গুলো ভিখিরি ছেলেদের মতো খিদেয়
মাটির অন্ধকারে গড়াগড়ি দিয়ে মাটিকেই কামড়ায়।
আর কোনোমতে সে-ও জড়িয়ে ধরলো তার বুক
হিল্লোলিত প্রেমের উদ্বেল ক্ষমতায়।

আর তক্ষুনি কী অপরূপ
শিউলির মতো ফোঁটা-ফোঁটা দুলের শব্দ!—
বৃষ্টির চেয়েও কোমল শব্দে ভরা তার সুমধুর শরীর
কলসের মতো ঢেলে পড়লো পোড়ামাটির দেহে
মমতায়,
ক্ষমতায়।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই
বৃষ্টির নদীতে হরিণের মতো মুখ রেখেছে
সব তৃষ্ণার্ত শিকড়।

বুড়ো লোকটা

তপন চট্টোপাধ্যায়

শাদা মাথা নড়ে আর সকৌতুকে চোখ বুজে হাসে।
ঝোলানো দাঁড়ের তোতা, তার সঙ্গে কথা ব'লে-ব'লে
সময় কাটিয়ে দেয়, তামাকের হুঁকো সঙ্গে চলে,
মুহুর্মুহু চাপে বুক, খুকখুক অবিরাম কাশে।

এই বুড়ো বহুদিন চেতনার জালের ভিতরে
অনেক দিনের চেনা অষ্টাদশ শতকের কাল,
গানের কলির মতো অতীতের, বর্তমান স্বরে
সে যেন আশ্চর্য আর বহুমূল্য স্মৃতির প্রবাল।

নির্জীব শরীর তার, কিন্তু যেই হাসে অকারণ,
তোবড়ানো দু-গাল শাদা দাড়ির জঞ্জালে অকৃত্রিম
কেমন করুণা জাগে, মনে হয় এই তো অসীম
কালের সৌন্দর্য আর শুভ্রতম মানব জীবন।

দাঁড়ের পাখিটা ডাকে সারাদিন, সন্ধ্যা যেই নামে
মূক হয়ে ব'সে থাকে ধীরে-ধীরে স্তব্ধতার সুখে,
ডুবে যায় ঠিক ঐ বুড়োটার মতন নাটুকে
বেজায় গম্ভীর মুখে কিছু ভাবে, অথবা আরামে

নতুন স্বপ্নের মুখে আরেক আশার কথা শোনে,
ন'ড়ে-চ'ড়ে ফের সেই স্তব্ধতায় ব'সে কাল গোনে।

দুটি কবিতা

অভিজ্ঞান

তারক সেন

রাত্রির আমডালে কোকিলটি ডেকে-ডেকে
ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে গেলো।
আর তখন সে উড়ে এসে বসলো
তার পাশের ডালে। উষার যৌবন জ্ব'লে
উঠলো নির্জন দিগন্তে। বিষণ্ণ রক্তাভ চোখ নিয়ে
কোকিলটি দেখলো সূর্যোদয়।
ওর রাঙা চোখের মতোই এই ভোর।

আমিও কি ডেকে-ডেকে ক্লান্ত হয়ে যাই নি ?
প্রত্যহের নতুন প্রতীকে আমি ডেকেছি।
জনতার মাঝখানে হেঁটে যেতে-যেতে
হঠাৎ অতিক্রম করেছি আমার স্বপথের সীমান্ত
কখন এসে পড়েছি অন্য এক দিগন্তে। আর
কখনো মৃদু ভাষে ডেকেছি— জনবিরল মধ্যাহ্নের সুরে।
কিন্তু আমার সব ডাকার পিছনে
অমনি এক ক্লান্তি
আমার ডাকার সব সুর, সব ধ্বনি
মুছে নিয়ে যায় তার নিপুণ চাতুর্যে।
আমার হাতের মুঠি থেকে
একটি সোনার হার যেন কেউ ছিনিয়ে নিলো
শহরের অন্ধকার গলিতে।

তবুও কি সে-পথ ছেড়েছি ?
তবু চোখ ভালোবাসে দৃশ্যের ইঙ্গিতে ভুলে যেতে
তবু কণ্ঠ ভালোবাসে প্রাণের গানের সুরে সুর দিতে—
তবু মন ভালোবাসে— শীতের শুকনো বাগানে পায়চারি।

যে-দিন চাইনি— সে-দিনেরও নদী পার হ'তে—
দিতে হোল সাতকড়া কড়ি
যে-রাত্রি চাইনি— তারও হাত ধ'রে
আমাকেই যেতে হ'লো ভোরের কুটিরে
তখনও কোকিল ডাকছিলো ঠিক এই সুরে।
আবার কালও ডাকবে এই কোকিলটি
অবিচ্ছিন্ন। আমি জানি— আকাশের দিকে
না-তাকালেও— চাঁদ উঠবে, তারা ফুটবে— আর
রাতের কোকিল ডাকবে।

তাই যে-রাতই আসুক—বলবো, এসো।
যে-দিনই আসুক— বলবো, এসো।
আমার ভালোবাসার নামাঙ্কিত আংটি
পরিয়ে দেব তাদের আঙুলে। চোখে চোখ রেখে
গল্প শুনতে বসবো জীবনের।

দীপ

সত্যি বলছি— চোখের জল ফেলো না।
আমি তা সইতে পারি না ব'লে নয়,
আমি তা মানতে পারি না।

দ্যাখো, কত কাছাকাছি আমরা,
আর কত কাছাকাছি আমাদের প্রতিবেশী, শত্রু ও বন্ধুরা।

আমাদের পিছনে সজাগ শত্রুর হিংসা,
আমাদের জন্য কাতর বন্ধুর হৃদয়।

তবু যদি চোখের জল ফেলো
শত্রুর হাসিতে ঝনঝন ক'রে উঠবে
এই পুরোনো ঘরের দরজা জানালা,
আমাদের গুপ্ত ফোটোখানা হয়তো ঝনাৎ ক'রে
মাটিতে প'ড়ে চুরমার হয়ে যাবে
আর পাশের বাড়ির মিষ্টি বৌদি—
ঘুম ভেঙে ছুটে আসবে আমাদের খবর নিতে।

এসে দেখবে— চারদিকে চোখের জলের ঢেউ
তুমি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো
পৃথিবীর সুন্দর ভূভাগ থেকে।
বলো, চোখের জল ফেলতে-ফেলতে আমরা কি
জলবেষ্টিত দ্বীপ হয়ে যাবো না?
তখন তোমার আর আমার
আমার আর মিষ্টি বৌদির মাঝখানে
শুধু লবণাক্ত জলরাশির কলরোল।
তখন আবার আমরা কাঁদবো—
পরস্পর হাতে হাত রাখার জন্য
কানে-কানে কথা বলার জন্য
নারকেল গাছের পাতার আড়ালে
ঝিরঝির চাঁদ দেখার জন্য।
বলো, কাঁদবো না কি?

তাই বলছি— কেঁদো না।
কান্নার উপকণ্ঠ ছেড়ে— চলো যাই
বৈকালী শহরের ভিড়ে,
অথবা নির্জন মাঠে ব'সে-ব'সে শহরের সন্ধ্যা দেখি, চলো।

আবিষ্কার

উৎপলা মুখোপাধ্যায়

নানান কাজের ভিড়ে দ্বন্দ্বময় সকালে সেদিন
দেখেছি পায়ের কাছে পিঁপড়ের ব্যস্ত চলাফেরা,
সূর্যের বিলাসী আলো এপারে ওপারে উদাসীন,
দিগন্ত সমুদ্র-নীল—পাহাড়-বলয় দিয়ে ঘেরা—
এ-ঘরে ও-ঘরে গান, শিশুর হাসিতে যায় দিন।

খেয়ালি পিঁপড়ে কি জানে এ-পৃথিবী, কিংবা মায়াময়
আকাশ-প্রচ্ছদপট, পৃষ্ঠা যার কখনো খোলে না;
অথচ অস্থিরমন মানুষের অতৃপ্ত বিস্ময়
এ-রহস্যে মাথা খোঁড়ে; ব্যর্থ হয়, তবুও ভোলে না
এ-ভাবেই দগ্ধ হ'তে, দুঃখ পায় অনন্ত সময়।

সুখী পিঁপড়ে, ছোটো মন, সার্থকতা পায় চিরকাল,
মেলে দেয় এককণা শান্তি তার সব আয়োজনে;
অতৃপ্তির চরাচরে অজানার মগ্ন ইন্দ্রজাল
উদ্বিগ্ন করে না তাকে, বিড়ম্বিত হয় না জীবনে;
তেমনি কি ক্লান্ত মনে আমিও সে-সুখেরই কাঙাল?

কার লীলায়িত মনে ছুটে যায় এই ছোটো মন,
বিস্ময়ের ব্যাপ্তি ছেড়ে, রহস্যের জ্বালা থেকে দূরে
সামান্যে আশ্রয় চায় পুণ্যতীর্থ পিঁপড়ের মতন!
দৈন্যের দিগন্তে আজ জীবনের বধির দুপুরে
খণ্ডিত মেঘের মায়া জাগালো কি অকালবোধন?

স্বপ্নভরা রাত

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নভরা রাত— তারারা তন্ময় :
তোমার কালো চোখে আলোর শিখা জ্বলে,
আমার মন চায় সুরের বিনিময় ;
স্বপ্নভরা রাত, তারারা তন্ময়।

সুপ্ত কামনারা শোণিতে কথা বলে,
তোমাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মদির হাওয়া বয়।
স্বপ্নভরা রাত, তারারা তন্ময় ;
তোমার কালো চোখে প্রেমের শিখা জ্বলে।

দুটি কবিতা

পাখি জানে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

পলক পড়ে না, পাতা ঝরে না কোথাও। শুধু পাখি
এগাছে-ওগাছে খেলা করে, স্তব্ধ ছায়ার ভিতর
দুপুরের দুঃখ দেখে ব'সে। আর, এদিকে এ-ঘর
জ্বরের উত্তাপে কাঁপে : এখনি বিকেল হবে নাকি ?

শিয়রে তো কেউ নেই। একমাত্র রোদ্দুরের স্মৃতি
ছায়া হয়ে প'ড়ে আছে। টেবিলে ওষুধ, গ্লাশে জল,
এবং শয্যায় কেনা শুকনো ফুল, কিছু ঠাণ্ডা ফল।
আর এই চারদেয়ালে দুপুরের আশ্চর্য নিভৃতি।

বিকেলে কে এসে বলবে, বেলা গেলো, শোনাবে সন্ধ্যার
স্বরলিপি। কে দেখাবে আকাশে নক্ষত্র, ঘরে আলো ;
ভালোবেসে কে বোঝাবে শুধু— এটা মন্দ, ওটা ভালো।
কার স্পর্শে মনে হবে, এ-রাত্রিও রজনীগন্ধার।

দুপুরের খোলা ঘরে একটি পাখির যাওয়া-আসা ;
যে-অদৃশ্য হাত, বুঝি পাখি জানে, সে-ই ভালোবাসা।

নদীর নায়ক, সূর্যের নায়িকা

দর্পণে কে কাকে দেখে ; এই আলো, এই অন্ধকার।
মেঘলা ভোরের সঙ্গে যেতে-যেতে সূর্যের নায়িকা
দৃশ্যের সবুজে শরীরিণী, যেন লজ্জার লিপিকা
তার সারা অঙ্গে, শ্লথ চরণে ছন্দের উপহার।

যা আছে আমার, এই নাও— ব'লে নদীর নায়ক
ব'সে থাকে অন্ধকারে। আকাশ আলো-কে ডেকে বলে,
এসো, এসো। আলো হেসে যৌবনের গর্বের গরলে
হয় সমুদ্রের নীল।— দৃশ্যান্তরে বিরত নাটক।

দর্পণে যে আছে থাক ; যে নেই সে যাক দূরাকাশে,
মেঘে-মেঘে এই ক্ষীণ দিনের শিয়রে স্বপ্নময়
নদী, তার স্নিগ্ধ দেহ ; ঐশ্বর্যে সম্পূর্ণ সে তো নয়।
বৃথাই হেনেছো বাণ ! কে কাকে ভোলায়, ভালোবাসে ?

কেউ না। দর্পণে তাই সকালের শৌখিন ভ্রূকুটি ;
যে-হাত হাতের বাইরে, বেলা থাকতে তাকে দাও ছুটি।

দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ

ফ্রীডরিখ হেল্ডারলিন

১

প্রত্যহ যাত্রায় বাধ্য, অবিরাম অন্য কিছু খুঁজে-খুঁজে আমি
ঘুরেছি, করেছি প্রশ্ন, বহু পূর্বে, সব পথ, প্রান্তর, কান্তারে ;
ঐ দূরে হিমস্রব শৃঙ্গদল, উৎসমুখ, পুষ্পিত ছায়ার প্রান্ত,
সর্বত্র গিয়েছি অবিরল ; উচলে নিতলে ঘুরে-ঘুরে, আত্মা চায়
ক্ষণিক বিশ্রাম ; যেমন ভয়ার্ত মৃগ অরণ্যগহ্বরে
পলায়, যেখানে ছিলো অন্ধকার তন্দ্রা-ভরা দ্বিপ্রহর তার ;
কিন্তু সে-শ্যামল নীড়ে আর তার শান্তি নেই, অথবা সান্ত্বনা,
উন্নিদ্র, বিলপমান, কণ্টকে তাড়িত হ'য়ে হারায় সে দিশা,
দেয় না আশ্রয় তারে উষ্ণ আলো, বন্ধু নয় শীতল নিশীথ,
অযথা ডোবায় ক্ষত নির্বিকার নদীর ধারায়।
যেইমতো, অভিশপ্ত হরিণীরে, ধরণী বৃথাই দেয় তৃণদল,
অনর্থক মলয় ব্যজন করে তাপময় ফেনিল শোণিতে,
তেমনি আমারও ভাগ্য, বন্ধুগণ ! দুঃখে নত আমার ললাট থেকে
কেউ কি নামাতে পারে এ-স্বপ্নের অতিগুরু ভার ?

২

জানি, জানি, মৃত্যুর দেবতা, তুমি একবার অবল মানবে
যদি করো কবলিত, বাঁধো তারে কঠিন শৃঙ্খলে,
নাও তারে, দুর্দম অশিবদল, তমস্বিনী নিশার কন্দরে টেনে,
তাহ'লে আক্ষেপ বৃথা, মিনতির মূল্য নেই, আক্রোশের বর্ষণ অক্ষম,
আর যদি নির্বাসন মেনে নেয়, দুঃস্বপ্নে পরম ধৈর্যে সহ্য করে,
শোনে তব বিষাদকীর্তন হাসিমুখে, তাও ব্যর্থ, তেমনি নিষ্ফল।
যদি তা-ই হয়, তবে কল্যাণেরে নিঃশব্দ নিদ্রায় ভুলে যাও !

কিন্তু শুনি এখনই তোমার রন্ধ্রে উৎসারিত কোন সুর, আশার নিস্বন,
আত্মা মোর, এখনো পারোনি তুমি মেনে নিতে ; ভবিতব্যে অভ্যস্ত, অথচ
আজও তুমি স্বপ্ন ছাখো অয়স্কান্ত নিদ্রার আধারে।
উৎসবের দিন আজ নেই আর, তবু আমি পুলকিত মাল্য চাই ;
নই কি সম্পূর্ণ একা, সঙ্গহীন ? কিন্তু কোনো করুণা আসন্ন, জানি,
দূর থেকে আমার অন্তরতম, তাই মোর বিস্ময়ের সীমা নেই,
যেহেতু জেনেছি এই শোকপাশ কী আনন্দময়।

৩

হে প্রেম, সোনার আলো, তবে কি মৃতের তরে উদ্ভাস তোমার ?
দিনের উজ্জ্বলতর ছবি, সে কি দীপাবলী আমার রাত্রির ?
সুন্দর কাননশ্রেণী, শৈলমালা সন্ধ্যার সিন্দূরে লাল,
স্বাগত জানাই সকলেরে ! আর তুমি, মৃদুভাষী বনপথ,
তোমরা, নক্ষত্রদল, চক্ষুষ্মান, পুলকিত স্বর্গের প্রমাণ—
একদা আমাকে যারা প্রীতিময় আশিসে করেছো ধন্য—
তোমরাও, হে প্রেমিক, হে প্রেমিকা, ফাল্গুনের অমল সন্তান,
অবিকল গোলাপ, কহ্লারদাম, আজও আমি তোমাদের স্মরি।
সত্য, জানি, বসন্ত বিলীয়মান, বৎসরের অগ্রজবিনাশে
বিক্ষুব্ধ অনন্তকাল যুযুধান, পরিবর্তমান ;
মরলোকে আমরা অধীন তার, কিন্তু যারা অভিষিক্ত, আর যারা একান্ত প্রেমিক,
অন্য এক জীবনে আদিষ্ট তারা, এ-দারুণ সংগ্রাম ছাখে না।
কেননা যা-কিছু বৃত, নক্ষত্রের সব দিন, সকল বৎসর,
ঘিরেছিলো সেদিন মোদের সত্তা, দিগুতিমা, অন্তহীন অন্তরঙ্গতায়।

৪

কিন্তু মোরা, তৃপ্তির আবেশে যুক্ত হ'য়ে, বিচরণ করেছি ধরায়
মরালমিথুন-সম, যবে তারা সাগরে বিশ্রাম করে, অথবা, তরঙ্গে আন্দোলিত,

চেয়ে থাকে জলের গভীরে, যেথা রজতসন্নিভ মেঘদল
ছায়া ফেলে চ'লে যায়, ভেসে যায় নাবিক-যাত্রীর পথে
নীলিমার প্লুত স্রোতে। আর হিম উত্তর যদিও
লোল ক'রে দিলো ঝঞ্ঝা, প্রেমিকের প্রতন শত্রু সে,
ছড়ালো ক্রন্দন, ত্রাস, শাখা হ'তে পত্রদল, দিগ্বিদিকে উড্ডীন বর্ষণ,
তবু মোরা হেসেছি, শুনেছি সুর, মিলিত আত্মার ঐকতান,
অন্তরঙ্গ আলাপনে পরিপূর্ণ, নন্দিত শিশুর মতো, প্রশান্ত, একেলা,
পেয়েছি অন্তর-তলে আপনার দেবতার গভীর পরশ।
কিন্তু আজ উচ্ছিন্ন আমার বাস্তু, এমনকি দৃষ্টি অপহৃত,
মনে হয় প্রেয়সীরে হারিয়ে আমার আপনার সত্তা আর নেই।
তাই আমি ভ্রাম্যমাণ, তাই মোর নিয়তি এখন
নিতান্ত ছায়ার মতো বেঁচে থাকা, অন্য সব বহুদিন অর্থহীন হ'য়ে ঝ'রে গেছে।

৫

উৎসবে আকাঙ্ক্ষা মোর, কিন্তু কেন, কিসের উৎসব ? চাই, আমি গান গাই
অন্যদের সহযোগে, কিন্তু আমি একা আর দেবতুল্য কিছুই আমার নেই।
এ-ই তো আমার ত্রুটি, জানি আমি, এ-ই সে পাতক যার অভিশাপে
বিকল আমার পেশী, ব্যর্থ শ্রম, আরম্ভেই পতন নিশ্চিত,
তাই আমি নিঃসাড় কাটাই ব'সে সারা বেলা, শিশুদের মতো শব্দহীন,
শুধু মাঝে-মাঝে নামে নয়নের প্রান্ত বেয়ে হিম অশ্রু, আর
হানে গাঢ় বিষাদকালিমা প্রাণে বিহঙ্গকূজন আর বনের কুসুম,
কেননা তারাও দূতী আনন্দের, অমর্ত্যবাসীর বার্তাবহ।
কিন্তু সূর্য, যে দেয় জীয়ন-মন্ত্র, আমার বেপথুমান বুকে
সেও আনে, রাত্রির রশ্মির মতো, তুহিন বন্ধ্যতা,
ব্যর্থ, হায়, ব্যর্থ আর শূন্যময় ঝুলে আছে, নিষ্ঠুর, নিশ্বাসরোধী,
আমার মাথার 'পরে কারার প্রাচীর-সম আকাশের পুঞ্জীভূত ভার।

৬

একদা, যৌবন, তুমি কত ছিলে অন্যরূপ! পারো না কি তোমাকে ফেরাতে আর
কিছুতেই আমার প্রার্থনা? নেই কি একটি পথ প্রত্যাবর্তনের?
আমিও কি তাহ'লে তাদেরই অন্যতম, দেবতায় বঞ্চিত দুর্ভাগা যারা,
দীপ্ত চোখে অমর্ত্যের পংক্তিভোজে একদা অতীতে বসেছিলো,
তারপর, ভোগক্লান্ত অসংখ্য ইতর জন, অচিরে হারিয়ে কণ্ঠ,
প'ড়ে আছে নিদ্রার গহ্বরে, যেথা অতল পাতালে
শীতল পবন নেই, নেই ফুল্ল, মুঞ্জরিত বসুন্ধরা—
অবরুদ্ধ, আশাহীন, যতদিন অলৌকিক দিব্য ক্ষমতায়
আবার না জেগে ওঠে, নূতন উৎসাহে ভ্রমে তৃণময় শ্যামল প্রান্তরে।—
পূত বায়ু, ঐশ্বরিক রূপান্তরে, প্রতিমারে করে নিশ্বসিত
যবে প্রেম, উৎসবের পুরোহিত, উদ্বেল বন্যায়
গর্জমান, সপ্রাণ নদীর মতো ধায় বেগে সাক্ষাৎ স্বর্গের
ধারাপুষ্ট, নিম্নলোকে জাগে তার প্রতিধ্বনি, রাত্রি দেয় রত্নের সম্ভারে
পূজা, নদীগর্ভে মাটির গুণ্ঠন ছেঁড়ে জলন্ত কনক।

৭

কিন্তু তুমি, প্রিয়তমা, যে-তুমি, পথের মোড়ে আমি পড়েছিলাম যখন
তোমার চরণপ্রান্তে, তখনই সান্ত্বনা দিয়ে, শুনিয়ে দীপক-মন্ত্র, হাতে ধ'রে
দেখিয়েছো আমাকে নিগূঢ়তর সুন্দরের পথ, শিখিয়েছো নয়নে, কণ্ঠেরে
মহান দৃষ্টির জ্যোতি, দেবতার হৃষ্টতর গান—
সেই তুমি, অমরসন্তান, সেই মতো শান্ত, মৌন, আবার কি দেখা দেবে মোরে
প্রতন কালের মতো, হ্লাদিনী, শক্তির উৎস, উদ্ধার আমার?
ছাখো, আমি ক্রন্দনে আবদ্ধ আজ; তুমি আছো, তথাপি বিলাপ
স্মৃতির গৌরবে হানে, লজ্জা দেয় আমার আত্মারে।
কেননা এ-দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল, পৃথিবীর শ্রান্ত পথে ঘুরে-ঘুরে,
তোমাতে অভ্যস্ত ব'লে, তোমাকেই অরণ্যে খুঁজেছি শুধু,
খুঁজেছি, রক্ষিকা মোর, অনর্থক! যেহেতু বৎসর, মাস, শূন্যতায়
গ'লে গেছে, যবে থেকে অশুভ সন্ধ্যার আভা গাঢ় হ'তে দেখেছি আমরা।

৮

কিন্তু তুমি, হে নায়িকা, আছো তব সবিতার দীপ্তির আশ্রয়ে,
তোমার তিতিক্ষা, ক্ষমা, হে কল্যাণী, তোমাকেই প্রেমে করে সঞ্জীবিত;
এমনকি তুমিও নিঃসঙ্গ নও, কেননা যেখানে তুমি বৎসরের গোলাপের দলভুক্ত
হ'য়ে
বিশ্রামে বিকাশো, আছে সেখানেও তোমার খেলার সঙ্গী, আর পিতা স্বয়ং
তোমারে
আর্দ্রমন সরস্বতীর দৌত্যে করেন প্রেরণ
সপ্রেম কোমল গানে নিদ্রার মধুর অভিসার।
আজও তুমি অবিকল! আশিরচরণতল আথেনীয়,
শান্ত পায়ে ভ্রাম্যমাণ, চিরন্তনী, আছো তুমি আমার দৃষ্টিতে।
এবং, পরম বন্ধু, যবে তব ললাটের প্রশান্ত ভাবনা থেকে
ঝ'রে পড়ে মানবের মরতায় প্রমিত, মঙ্গলময় আলো,
তখন আমাকে বলো, দাও তার অমোঘ প্রমাণ,
যে-কথা আমিও পুন ব'লে যাবো অবিশ্বাসী হতভাগ্যদের—
তীব্র হোক রোষানল, দুঃখতাপ, তবু ধ্রুব আনন্দ অন্তিম,
তবু সেই সোনালি প্রত্যূষ জলে পরিশেষে এখনো প্রত্যহ।

৯

অতএব, দেবগণ, তোমাদেরও দেবো আমি ধন্যবাদ, আর অবশেষে,
কবির অন্তর থেকে মুক্ত হবে প্রার্থনার নির্ঝর আবার।
একদা, প্রিয়ার পাশে, সূর্যকান্ত চূড়ায় যেমন
দাঁড়িয়েছিলাম আমি, সেইমতো, প্রাণের সঞ্চারে পূর্ণ, দেবতা সরব আজ গভীর
মন্দিরে।
আবার আরম্ভ তবে জীবনের! ঐ জলে এখনই নূতন কুঞ্জ! ঐ তো সমুখে
হানে যেন স্বর্গীয় বীণার ধ্বনি আপোলোর রুপোলি শিখর।
ছাখো! সব মিলায় স্বপ্নের মতো! স্বাস্থ্য, বল পূর্ণ হ'য়ে ফিরে আসে
বিক্ষত পাখায় তব; তরুণ, নতুন হ'য়ে বাঁচে পুন সব আশা, বাসনা তোমার।

মহত্ত্বে জেনেছি, তা-ই বহু মানি, তবু আরো বহু থাকে বাকি,
এইমতো যে ভালোবেসেছে তার অনিবার যাত্রা তাই দেবতার পথে।
তবে হও আমাদের সহযাত্রী, হে পবিত্র ঋতুদল, গম্ভীর, তারুণ্যময়,
থাকো সঙ্গে চিরকাল! আর অনুকম্পায় কোমল যারা প্রেমিকের সঙ্গ নিতে
ভালোবাসো, হে পূত স্বজ্ঞার দল, ঐশ্বরিক অনুনয়, হে অনুপ্রেরণা,
থাকো সবে আমাদের দু-জনের সহচর, থাকো, যতক্ষণ
মানবের সামান্য ভূমিতে, যেথা অভিষিক্ত আত্মা পুন নেমে আসে,
আছে গ্রহ, নক্ষত্র, ঈগল, যারা সাক্ষাৎ প্রিয়ার দূত, এবং যেথায়
বীর আর প্রেমিকেরা জন্ম নেয়, সরস্বতী এখনো আছেন—
যতক্ষণ সেইখানে, অথবা হয়তো এই গলমান বরফের দ্বীপে,
সমবেত কাননসমূহ যেথা অবশেষে যুগপৎ মুঞ্জরিত হ'লো,
না হয় সার্থক সত্য আমাদের সব কাব্য, ফাল্গুন মধুর থাকে দীর্ঘকাল,
অলক্ষ্যে আরম্ভ হয় আমাদের হৃদয়ের অন্য এক নূতন বৎসর।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

বিকল্পে উটের সার

নরেশ গুহ

বিকল্পে উটের সার, জীবনের গতায়ু বছর।
বালির দুর্গম তাপ, অস্থিসার উপত্যকা, কঙ্কাল করোটি খসা ঝড়
পায়ে পায়ে সঙ্গ নেয়; জলের উতল গন্ধে
খেজুরের রুশ ছায়া খুঁজে
ক্রমশ শুকিয়ে আসে সঞ্চয় যা ছিলো মেদ কুঁজে।
ধ্ব'সে পড়ে দিনরাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয়;
শান-দেওয়া অন্ধকারে ক্ষ'য়ে যায় নক্ষত্রবলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ;
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয় মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।
অঙ্গার পথের ধুলো, আকাশ মূর্ছায়
ঢ'লে পড়ে ডাইনির গুহায়।
এবং হাওয়ার আগে দিক দেখায় কপট প্রেতেরা।
বিকল্পে—উটের সার
কখনো ফিরবে না আর,
যেহেতু সম্ভব নয় ফেরা,
যদিও অকল্পনীয় রাত্রিশেষে নগরের দ্বার,
বাগানে পাখির গান, ঈশ্বরের ঘুমন্ত সংসার॥

তিনটি কবিতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

পাথর-দিন

(রঁদো)

একলা দিন মৌন বয়
প্রবহমান নিঃসময়
শটিত এক ক্লান্তিবোধ
ইচ্ছা সব করলো রোধ
মনের সাধ হ'লো বিলয়।

কোথা জীবন বর্ণময়!
শিথিল ক্ষণ কুসুম-নয়;
পাষাণ-ভার এ-ন্যগ্রোধ
একলা দিন।

এ-দিন হোক ত্বরিতে ক্ষয়
প্রাণে এ-ভার কতো বা সয়?
অধীরতায় ওতপ্রোত
আসুক ঝড়, আসুক স্রোত;
করুক জয় ভার-নিলয়
একলা দিন॥

হৃত-রোমাঞ্চ দিন

(ভিলানেল)

হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে
ওড়ালে কোথায় কী মন্ত্রে ছলোছলো
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

কাশের গুচ্ছে শরতের মেঘ ফিকে
রং নেই তাতে, স্বাদ নেই—কী-যে জোলো;—
হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে

ভরা দিনগুলি সুদূরে না অস্তিকে
খালি ক'রে বুক কোথায় পাঠালে, বলো?
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

কোথা পাই কেলি-চঞ্চল ঊর্মিকে
মরা-নদী-বুকে জল নয় উচ্ছলও
হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে

নিয়ে গেলে ডেকে কোন আড়ালের চিকে?
রুকলাস-কাল বর্ণও বদলালো!
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

উধাও হবার কৌশলটুকু শিখে
যতো জ্বালা দাও নিজে আরো বেশি জ্বলো;
হাতছানি-ঝরা আহ্বান-লিপি লিখে
সেই সব দিন ডেকে নিলে কোন দিকে?

মাঝরাতের ডাকবাংলোয়

রাত্রির কিনার ঘেঁষে ট্রেন গেলো দূরে ব্রিজ দিয়ে,
নিঝুম অচেনা রাত উচ্চকিত হ'লো একবার।
মুহূর্তের আলোড়ন তারপর গিয়েছে থিতিয়ে;
গুড্‌স্ ট্রেন নয় তো এ, হবে কোনো আপ্‌ প্যাসেঞ্জার।

ডাকবাংলোর শয্যা চটচটে কালো অন্ধকার
মাথে ; তাতে ধরা পড়ে উড়ো কতো স্মৃতি-স্বর্ণ-মাছি।
খানসামা হেঁপো রুগী কাশে, শুনি ; ঘর রুদ্ধদ্বার।
ফের কাল যাত্রা শুরু, আজকের রাতটুকু আছি।

বাড়ি ছেড়ে এসেছি কোথায় ; যারা ছিলো কাছাকাছি—
প্রত্যহের ব্যবহারে দরকারি যতো চেনা মুখ
ঘিরে ধরে ; বাড়ি ফেরা অবধি না, ধরো, যদি বাঁচি
তবে যে হবে না দেখা।—এ-মিনতি জানাতে উৎসুক।
এ-বিচ্ছেদ ভ'রে নিতে ফেলে রেখে আসিনি কি পুঁজি
কোনো কিছু ? ধোঁকা লাগে, অতীতকে পাতি-পাতি খুঁজি।

'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

ভাঙা ঘণ্টা

শীতের প্রখর রাত্রি, অগ্নিকুণ্ড ধূমল, চঞ্চল ;
কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া পুরাতন ঘণ্টার নিস্বনে
ভেসে আসে, দূর থেকে, ত্বরাহীন স্মৃতির দঙ্গল ;
মধুর তিক্ততাময় অনুভব ব্যাপ্ত করে মনে।

ধন্য সেই ঘণ্টা, যার কণ্ঠনালী সতেজ, সক্ষম
বার্ধক্যের প্রতিরোধে পুণ্য তানে ভ'রে দেয় দিক,
আশ্বাসের অনুবন্ধে অবিরল করে পরিশ্রম,
যেন এক শিবিরে চকিতচক্ষু প্রাচীন সৈনিক !

বিদীর্ণ আমার আত্মা ; নির্বেদের বাঁধন ছাড়াতে
গানের জনতা দিয়ে হিম হাওয়া চায় সে ভরাতে ;
অথচ, অনেক বার, মনে হয় তার ক্ষীণ স্বর

যেন এক মুমূর্ষুর নাভিশ্বাসে নিঃসৃত ঘর্ঘর,
যে মরে, মৃতের স্তূপে, বিস্মরণে, নিশ্চল নিষ্ঠায়,
রক্তের হ্রদের তীরে, অবিরাম বিরাট চেষ্টায়।

লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা

খিন্ন প্রাণ, একদা ছিলো সংগ্রামে আনন্দ তোর,
দীপ্ত আশা, রেকাব যার আগুন হানে রাত্রিদিন,
সে আর নয় সওয়ার তোর ! ঘুমো রে তবে লজ্জাহীন,
হুঁচট-খাওয়া জীর্ণ ঘোড়া, খন্দ-খানায় ভাঙলো জোর।

হৃদয়, তবে নে মেনে তুই পশুর মতো ঘুমের ঘোর।

বুড়ো ডাকাত ! জড়ায় তোরে পরাজয়ের অন্ধকার,
দেয় না দোলা যুদ্ধ, প্রেম ; সম্ভোগের সর্বনাশ !
বিদায়, তবে কাংস্য গান, বাঁশির প্রিয় দীর্ঘশ্বাস !
বিষাদময় হৃদয়ে নেই প্রলোভনের অঙ্গীকার।

বিশ্বজয়ী বসন্ত যায়, ফুরালো তার গন্ধভার !

প্রতিক্ষণে আমায় টানে অতল খাদে অসীম কাল,
যেন বিশাল তুষার-পাতে লুপ্ত এক কঠিন শব,
সুগোল এই ভূগোল জুড়ে যা-কিছু আছে দেখেছি সব,
খুঁজি না আর কোথাও বাসা, ক্ষুদ্র কোনো অন্তরাল।

নে, তবে নে আমায় টেনে, আভালাঁশের ধ্বংস-তাল।

ইকারুস-বিলাপ

হৃষ্ট, পুষ্ট, নিটোল তাদের স্বাস্থ্য,
যারা দেয় প্রেম চটুল গণিকাগণে।
—আমার লভ্য, মেঘের আলিঙ্গনে,
ভাঙা ডুটো ডানা, নিষ্ফল উদয়াস্ত।

অতল আকাশে জ্বলে অনুপম সিঁথি,
সেই তারাদল আমার উত্তমর্ণ ;
আমার দগ্ধ নয়নে, তাদেরই জন্য,
দৃশ্য কেবল চিত্রভানুর স্মৃতি।

বিরাট শূন্যে বৃথাই দিয়েছি হানা
প্রান্তে, কেন্দ্রে, সবল কৌতূহলে ;
জানি না সে কোন আগুন-চোখের তলে
বিচূর্ণ হ'লো আমার মত্ত ডানা।

সুন্দরে ভালোবেসে আমি আজ ভস্ম ;
সমাধিফলকে উজ্জ্বল সম্মানে
থাকবে না লিপিচিহ্ন আমার নামে,
আমার কেবল গহ্বর সর্বস্ব।

কোনো ক্রেয়ল মহিলাকে

সৌর সোহাগে মন্থর দেশ, গন্ধে ভরা,
সেখানে দেখেছি, বেগনি গাছের কুঞ্জতলে
ঘন তালবনে আলস্য ঝরে কলস্বরা—
অজ্ঞাত এক ক্রেয়ল রূপসী একলা জলে।

শ্যামল মোহিনী, উষ্ণ, মলিন বর্ণ ধরে ;
গৌরবে গড়া গ্রীবার মোহন কান্তি ;
প্রচুর তনুতে হেঁটে যায়, যেন মৃগয়া করে ;
হাস্যে, নয়নে ঝলকে প্রমার শান্তি।

মাদাম, যদি এ-গরিমার দেশে কখনো আসেন,
যেখানে সবুজ লোয়ার, অথবা ব'য়ে যায় সেন্,
যোগ্য রূপসী, প্রাচীন পুরীর অনুপ্রাস,

ছায়ার বিতানে ঐ কালো চোখ জাগাবে তখন,
মুগ্ধ কবির হৃদয়ে হাজার গানের চরণ,
হবে সে কাফ্রি দাসের চেয়েও দাসানুদাস।

হেমন্তের গান

(১)

বেশি আর দেরি নেই, মগ্ন হবো হিম কালিমায় ;
বিদায়, ক্ষণিক গ্রীষ্ম ! নামে দিন দ্রুত অধঃপাতে !

এই তো এখনই শুনি— শান-বাঁধা চত্বরে নামায়
জালানি কাঠের বোঝা, আতিময় ধ্বনির সংঘাতে।

আক্রোশ, আতঙ্ক, ঘৃণা, কয়েদির কঠিন খাটুনি—
সমস্ত প্রকাণ্ড শীত বাসা বাঁধে আমার সত্তায়,
হৃদয়েরে বেঁধে এক ঠাণ্ডা, লাল, দুর্ভর আঁটুনি,
যেমন মরন্ত সূর্য মেরুতটে নরকশয্যায়।

আবার কাঠের শব্দ! নিরন্তর আমি কম্পমান!
ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, তা কি আরো ধ্বংসময়?
হৃদয় আমার দুর্গ, অবিরাম গুরুগর্জমান
কামানের আক্রমণে অবশেষে মানে পরাজয়।

ব'সে-ব'সে মনে হয়— একতাল আঘাতে প্রহত—
কফিনে পেরেক ঠোকে ব্যস্ত এক দ্রুত অভিযান।
কার মৃত্যু?— এই ছিলো গ্রীষ্ম, আজ হেমন্ত আগত!
এ-শব্দ, রহস্যময়, যেন কার অলক্ষ্য প্রস্থান।

(২)

তোমার দীঘল চোখে ভালোবাসি সবুজ উদ্ভাস,
অথচ, লাবণ্যময়ী, আজ তিক্ত সব অভিজ্ঞান,
না তোমার প্রেম, গৃহ, না তোমার আলস্যবিলাস
মনে হয় সিন্ধুনীরে আন্দোলিত রৌদ্রের সমান।

তবু, হে মঞ্জুল প্রাণ, ভালোবেসো আমাকে এখনো,
দয়িতা, ভগিনী, এই কৃতঘ্নের হও তুমি মাতা;
হও সেই ক্ষণিক মাধুরী, যার আবাস কখনো
সূর্যাস্ত, অথবা এক হেমন্তের দীপ্ত ঝরা পাতা।

বেলা যায়! কবর অপেক্ষমান; ক্ষুধিত মরণ!
তোমার জানুতে মাথা, অপসৃত ললাটের বলি,
মনে আনি তপ্ত, শাদা নিদাঘের বিষণ্ণ স্মরণ,
এবং হলুদ, নম্র হেমন্তের আলোর অঞ্জলি।

বৃষ্টি ও কুয়াশা

হেমন্তের অবসান, শীত, আর পঙ্কময় বসন্তের দিন,
তোমরা, নিদ্রালু ঋতু, যারা ম্লান কুয়াশার আচ্ছাদনে লীন
ক'রে দাও আমার হৃদয় মন, যেন এক অস্পষ্ট কাফুনে
লুপ্ত ক'রে কবরে নামিয়ে দাও—মুগ্ধ আমি তোমাদের গুণে!

এই ব্যাপ্ত প্রান্তর, যেখানে ছোটে রাত্রি ভ'রে তুহিন তুফান
আর দীর্ঘ রাত্রি ভ'রে আবহকুক্কুট তোলে মর্চে-পড়া তান,
ঈষদুষ্ণ বসন্তের চেয়ে বেশি—আরো বেশি গূঢ় আকাঙ্ক্ষায়
উড়ে চলে আকাশে আমার আত্মা, অবারিত কাকের পাখায়।

যে-হৃদয় শবের সম্ভারে পূর্ণ, আর যার অন্ধকার ছেয়ে
বহুকাল ঝরেছে তুষারবৃষ্টি, তার কাছে কিছু নেই প্রিয়,
হে পাংশু ঋতুর দল, আবহের রাজ্ঞীরূপে যারা বরণীয়,

নিরন্তর ধূসর ছায়ায় ম্লান তোমাদের মুখশ্রীর চেয়ে,
—যদি না, যখন চাঁদ অবলুপ্ত, পাশাপাশি, অন্তরঙ্গ রাতে
পারে সে পাড়াতে ঘুম বেদনারে, কোনো-এক দৈবাৎ-শয্যাতে

De Profundis Clamavi

(পাতাল থেকে আমি ডেকেছি)

দয়া করো, আমার একান্ত কান্তা! পাতালের অন্ধকার থেকে—
যেখানে আমার চিত্ত ডুবে আছে—ভিক্ষা চাই করুণা তোমার।

—কাতর জগৎ, যাকে ঘিরে আছে সীসময় দিগন্তের দ্বার,
আর যেথা আতঙ্ক, পাপিষ্ঠ ভাষা রাত্রি ভ'রে ছোটে এঁকে-বেঁকে।

সূর্য এক উঠে আসে—তাপ নেই ; দেখা যায় বৎসরে ছ-মাস ;
এবং ছ-মাস ভ'রে ভূমণ্ডলে অবিরল রাত্রি রয় ছেয়ে ;
এই এক নগ্ন দেশ, বরফের মেরু নয় শূন্য এর চেয়ে ;
—নেই কোনো বনভূমি, নির্ঝরিণী, নেই পশু, এক ফালি ঘাস।

কী আছে কঠিনতর পৃথিবীতে, এর চেয়ে আতঙ্কে অধিক—
এই যে তুহিন সূর্য হিমস্রব হিংস্রতায় ভ'রে দেয় দিক,
আর এক আদিম প্রলয় যেন, এই গাঢ়, ব্যাপ্ত নিশীথিনী ;

আমি তাই জন্তুদের ঈর্ষা করি, অন্ধকারে তুচ্ছ যত প্রাণী
মূঢ় এক নিদ্রার বিবরে ডুবে কিছু কাল অনায়াসে ভোলে,
এমন মন্থর লয়ে সময়ের ক্ষমাহীন তন্তুজাল খোলে !

প্রোজ্জ্বল ক্লেদ

নির্বেদে নিষ্ঠুর তুই, পাতকিনী ! বিশ্বচরাচরে
বিঁধে নিতে চাস তোর অপ্রসর শয্যার শিয়রে।
দন্তের ব্যায়াম হবে, তাই—তোর কৌতুক দুঃসহ—
চাস তুই একটি শলাকাবিদ্ধ হৃদয় প্রত্যহ।
দীপ্ত দুই চোখ তোর, বিপণীর মতো উচাটন—
অথবা উৎসব যেন, গাছে-গাছে ঝোলানো লণ্ঠন—
স্পর্ধায় নিঃশেষ করে ক্ষমতার যত পায় ঋণ,
কেননা জানে না তারা সুন্দরের তারাও অধীন।

রে অন্ধ, বধির মূঢ়, যন্ত্রণার প্রসবে প্রচুর !
উপকারী উপলক্ষ্য, জগতের রক্তলোভাতুর,
লজ্জা কি পাস না তুই—বল, কোনো লজ্জার প্লাবনে
পাংশু হ'য়ে ঝরে না কি রূপ তোর কখনো দর্পণে ?

তুঙ্গ এই কদাচার, বিদ্যা তোর বেড়ে চলে যাতে,
তা থেকে, আতঙ্কে কেঁপে, চাস না কি কখনো পলাতে,
যেহেতু প্রকৃতি, রয় অন্তরালে অভিসন্ধি যার,
রে নারী, পাপের রানী, তোকেই করে যে ব্যবহার,
তোকেই, জঘন্য জন্তু, ছেনে নিতে ক্বচিৎ প্রতিভা

হায় রে প্রোজ্জ্বল ক্লেদ, মারাত্মক, হায়, দিব্য বিভা !

পিশাচী

এসেছিলি, আমার বুকের দুঃখ ছিঁড়ে
যে-তুই, এক তীক্ষ্ণ ফলার মতো,
লেলিয়ে দিয়ে দৈত্য-দানোর দামাল ভিড়ে
নেচে, কুঁদে, গ'র্জে অবিরত

পেতেছিলি রাজস্ব আর শয্যা, ওরে
যে-তুই, আমার ক্লান্তিমাখা মনে,
—পাতকিনী, আঁকড়ে আছি আমি তোরে
খুনে যেমন দড়ির আলিঙ্গনে।

—বাঁধা আছি, বোতলটাতে পাঁড় মাতাল
পাশায় যেমন জুয়াড়ি দেয় মতি,
কিংবা যেন পশুর শবে পোকার পাল,
—নরকে, হোক নরকে তোর গতি !

ভাবিনি কি, মুক্তি আমার মিলবে কিসে,
সাধিনি কি তীব্র তলোয়ারে ?
জপিয়েছি তো—ভীরু আমি—কপট বিষে,
"রক্ষা করো আমার আপনারে !"

কিন্তু, হায়, আমার 'পরে কী আক্রোশ—
গরল, ছোরা, তারাও বলে হেঁকে :
"মূর্খ! তুই মুক্তি পাবার যোগ্য নোস্
জাহান্নমের এই নাগপাশ থেকে।

পারিস তার রাজ্য থেকে পলাতে
আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
বাঁচবে পুন তোর পিশাচীর মড়া!"

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(জন্ম : জুন ১৯১০। মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬।)

কবিতার দ্বারা উপন্যাসের আক্রমণ আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ;—শুধু আক্রমণ নয়, রীতিমতো জয়, রাজত্ববিস্তার; গত একশো বছরের কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে তার মধ্যে স্পষ্ট দুটো বিভাগ চোখে পড়বে : একদিকে সরল বাস্তবপন্থা, লোকে যাকে জীবন বলে তার নিষ্ঠাবান আলেখ্য, অন্যদিকে নির্বাচন, অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যময় বিকৃতি—এক কথায়, কাব্যধর্ম। কবিতা, ছন্দ-মিলের শুদ্ধ রূপায়ণে বিপন্ন বোধ ক'রে, কেমন ক'রে বহুব্যাপ্ত গদ্যসাহিত্যের বড়ো একটা অংশকে অধিকার ক'রে নিলে, তার ইতিহাস রোমান্টিসিজম-এর পরিণতির সঙ্গে সমান্তর। বলতে লোভ হয়, ফরাশি প্রতীকীবাদের প্রভাব পরবর্তী কথাসাহিত্যেও সংক্রমিত হয়েছে—নয়তো মান্ কেমন ক'রে 'ভেনিসে মৃত্যু' লিখতে পেরেছিলেন বা জয়স তাঁর শিল্পী-যুবকের প্রতিকৃতি?—কিন্তু এও স্মর্তব্য যে ডস্টয়েভস্কি, যিনি কবি-ঔপন্যাসিকের গুরুস্থানীয়, তিনি শার্ল বোদলেয়ার-এর সমকালীন হ'য়েও কখনো 'ল্য ফ্ল্যর ত্যু মাল' পড়েছিলেন ব'লে জানা যায় না। অবশ্য এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তদন্ত নয়, তবে অনায়াস দৃষ্টিতেই এটুকু ধরা পড়ে যে সাহিত্যের চিরকালীন বাস্তববাদ যে-সময়ে জোলার হাতে উগ্র প্রকৃতিবাদে পরিণত হ'লো, সেই একই সময়ে য়োরোপীয় উপন্যাসে একটি বিপরীত ধারা বলীয়ান হ'য়ে উঠছে, যে-ধারা, তথাকথিত বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে, বাস্তবের অন্তরালবর্তী স্বপ্ন বা সত্যের সন্ধানী।

কিন্তু এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিণতির ধারা মেলে না। য়োরোপীয় কবিতায় ও উপন্যাসে যে-বিনিময়জনিত ভ্রাতৃত্ববন্ধন গ'ড়ে উঠেছে, বাংলায় তার লক্ষণ এখনো ক্ষীণ। বাংলা কবিতার কোনো-একটি অংশকে ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বলা যায়, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম অংশ আজ পর্যন্ত উনিশ-শতকী বাস্তববাদে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ, অদম্য কবি হ'য়েও, তাঁর কথাসাহিত্যে বঙ্কিমের অনুগামী হয়েছেন, এবং যেখানে তা হননি, অর্থাৎ যেখানে তাঁর মৌলিক কবিতাকে উপন্যাসের মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়েছেন,

সেখানে তাঁর উপন্যাসের (হয়তো কবিতারও) ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র চাঁদের দিকে তাকিয়ে কখনো কোনো 'মুখ-টুখ' দেখতে পাননি ব'লে গর্ব করেছেন; কবিদের উদ্দেশে তাঁর এই উপহাস নিজের মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে হয়নি তাঁর, কোনো বাঙালি পাঠকেরও রুচিহীন মনে হয়নি। যুক্তিবাদী প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই নিজেকে কমনসেন্স, সাধারণ বুদ্ধি বা 'সুবুদ্ধি'র প্রবক্তারূপে ঘোষণা করেছেন; 'চার ইয়ারী কথা'র রূপসী উন্মাদিনী কোনো মায়াপুরীর আভাস এনে দিলো না—নেহাৎই ডাক্তারি অর্থে পাগল হ'য়ে কল্পনার ডানা কেটে দিলে। এবং, সব ফেনিলতা সত্ত্বেও, 'কল্লোল' পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিলো 'রিয়্যালিজম'; তার তরুণ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে আপত্তি করেছিলো—তাঁরা বাস্তববাদী ব'লে নন, যথেষ্ট বাস্তববাদী নন ব'লে। তত্রাচ; সেই উত্তেজনার অধ্যায়েও, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রত্যেক রচনাই বাস্তব শিল্পের অবিকল উদাহরণ হয়নি—কেননা, কোনো লেখক বা সম্প্রদায়ের ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কখনোই সম্পূর্ণ মেলে না—আর মেলে না ব'লেই বাঁচোয়া—এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন শেষ বয়সে বুঝেছিলেন তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বাস্তবতার গুণেই আদরণীয়, তেমনি, ততদিনে, নব্য লেখকরাও কেউ-কেউ মেনেছিলেন যে নিছক বাস্তববাদে, শেষ পর্যন্ত, তৃপ্তি নেই।

বাংলা সাহিত্যের এই সন্ধিক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ। দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হননি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিলো; শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ সে-জমি ততদিনে জেতা হ'য়ে গেছে, এবং, একই কারণে, মণীন্দ্রলাল ও গোকুলচন্দ্রের স্থূলেও তাঁকে কখনো হাত পাকাতে হয়নি। তিরিশের দশকে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলী পড়েছেন, তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ক ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবতই, তাঁর বিষয়ে প্রথম গুণগ্রাহী আলোচনা করেন 'কল্লোলে'রই প্রাক্তন লেখকরা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-গোষ্ঠী—যার আদর্শের উচ্চতা সে-সময়ে কুখ্যাত ছিলো, আর যার সঙ্গে 'কল্লোলে'র কোনো মিল ছিলো না, তারও তরফ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁকে

অভ্যর্থনা জানাতে বেশি দেরি করেননি। মতভেদ ছিলো না সে-সময়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক শক্তিতে অসামান্য।

বর্তমান নিবন্ধকার একবার বলেছিলেন যে বাংলা কথাসাহিত্যে দুটো ধারা লক্ষ্য করা যায়: একটা বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র, অন্যটা রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী থেকে উৎসারিত। এই কথাটাকে এখন মনে হচ্ছে শোধনসাপেক্ষ; সত্যের নিকটতর হয় এ-কথা বললে যে বঙ্কিম, পূর্ব-রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্র একই মূল ধারার অন্তর্গত, এবং উত্তর-রবীন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্য ভাষাকে যতটা বদলেছেন, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারণাবিষয়ে ততটা পরিবর্তন আনতে পারেননি। আনতে পারেননি—এই ব্যর্থতার আংশিক দায়িত্ব পরবর্তী লেখকদেরও নিতে হবে, অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে কোথাও কোনো পরিণতির ইঙ্গিত দেননি তাও নয়। কিন্তু আজকের দিনে যখন বলি যে অন্নদাশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের বিপরীত লেখক, তার অর্থ এই যে অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ আলাদা জাতের গদ্য লেখেন, সামাজিক বিষয়ে তাঁর মতামতও ভিন্ন, কিন্তু উপন্যাস বস্তুটি কী—সে-বিষয়ে এই অসবর্ণ লেখকদ্বয়ের মূল ধারণায় বিশেষ প্রভেদ বোঝা যায় না। বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম ধারাটি আজ পর্যন্ত বাস্তববাদের পরিপোষক; ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ বাস্তবতাই বৃহত্তম ধারাটির মহত্তম উপজীব্য। উপন্যাস বলতে বাঙালি পাঠক বোঝে—তথ্যের সজীব ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিচিত্রণ, যে-সব তথ্য স্বভাবী মানুষের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত: এবং অধিকাংশ বাঙালি লেখকও তা-ই বোঝেন।

বলা যেতে পারে, এই স্থূল থেকে সব ঔপন্যাসিকই যাত্রা ক'রে থাকেন। অর্থাৎ, স্বভাবী বা স্বাভাবিকের বর্ণনায় যাঁর কিছুমাত্র দক্ষতা নেই তিনি কখনো ঔপন্যাসিক হবেন না, যদিও কবি হ'তে পারেন। কিন্তু অনেক পশ্চিমী লেখক বাস্তব থেকে যাত্রা ক'রে বাস্তবের পরপারে পৌঁছন; উত্তীর্ণ হন, সারি-সারি আপাতবাস্তব চিত্রকল্পের সাযুজ্যে, প্রতীকের, এমনকি পুরাণের মায়ালোকে। বাস্তব চিহ্নসমূহ 'জীবন্ত' হয় না তা নয়—তা না-হ'লে তাঁদের প্রয়াস নীরক্ত রূপকমাত্রে পরিণত হ'তো—কিন্তু তাঁদের কাছে বাস্তব একটা ছল বা উপায় বা অভিনয়মাত্র, যার ব্যবহারে, সত্যিকার কবির মতো, মানব-মনের গোপন, সনাতন, নামহীন সম্পদকে তাঁরা ছেঁকে তোলেন। লক্ষ্যণীয়, মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এর উল্টো প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে : তাঁর পূর্ব-রচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথমে বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম উপন্যাসের শিরোনামাতেই কবিতা আছে ; 'দিবারাত্রির কাব্য' শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্য-কবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম 'পাকা লেখা', সবচেয়ে কম স্পষ্ট, কিন্তু সেইজন্যেই তাতে বার-বার দিগন্ত দেখা যায়, যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে-থেকে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে, এমনকি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়—তাদের নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও—এই অলৌকিকের উদ্ভাস আমরা অনুভব করতে পারি, বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর প্রতিনিধি, এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটি আয়তন পায়—যেটা তথ্যগত নয়, ভাবগত। পরবর্তী, এবং এক দিক থেকে আরো পরাক্রান্ত রচনায়, এই ভাবায়তনের বদলে দেখা দিলো কঠোরতর বস্তুনিষ্ঠা, এবং এক মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা, যা পাঠকের কোনো দুর্বলতাকেই দয়া করে না, ভয় করে না সমাজের নিম্নতম পাঁক থেকে বাস্তবের ছবি উদ্ধার ক'রে আনতে। আস্তে-আস্তে এক দিগন্তহীন চতুষ্কোণ প্রদেশ তিনি দখল ক'রে নিলেন : মানুষের নিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উদ্ভাবনে উর্বর, জীবনসংগ্রামে আরক্তিম—যেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগী, কেরানি এবং কেরানির বৌ জীবন ও প্রজননের মূল সূত্রে অবিরাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য, এবং বাস্তবতাই এর প্রধান গুণ। অর্থাৎ, এর মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই ; হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা—এই সব ঘুরে-ফিরে দেখা দেয়, এমনকি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায় না তা নয়, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়। একটি গল্প মনে পড়ছে যার নাম 'বিবেক' ; তাতে এক দারিদ্র্যক্লিষ্ট পুরুষ মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টায় প্রথমে এক ধনী বন্ধুর ঘড়ি, পরে তার নিজেরই মতো এক দরিদ্রের টাকা চুরি করলে ; তারপর, তার স্ত্রীর বাঁচার আশা নেই, বড়ো ডাক্তারের এই রায় শুনে সন্তপ্তচিত্তে ধনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু গরিব বন্ধুর প্রাপ্য বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রইলো।

মানুষের বিবেক স্থূল ধনীর পক্ষপাতী, এই ব্যঙ্গই এখানে অভিপ্রেত ; এবং অনুরূপ আরো অনেক উদাহরণ অনেক পাঠকই মনে আনতে পারবেন। বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্য-বোধের দ্বারা আক্রান্ত হ'তে দেননি ; তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন', 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ন' প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপরীতগুলো কোনো ভাবগত আদর্শের চাপে ভেঙে পড়ে। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বভাবীরাও ছায়ামূর্তির মতো হানা দেয় না, রক্তেমাংসে সীমিত হ'য়ে থাকে ; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় ঘটনাবিন্যাসও সর্বদাই যথাযথ মনে হয়। মধ্য-বিশ-শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি ; যে-সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীর একটা অংশ প্রবল হ'য়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালের জন্য মূর্ত হ'য়ে রইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয় ; বঙ্কিমের মতো, অথবা কোনো-কোনো উত্তরপুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে দূরে স'রে যেতে হয়নি ; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয়নি অতীতের কোনো নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে : বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন, এবং তার যে-অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, তা সাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

চিঠিপত্র

মেঘদূত-এর অনুবাদ

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

সংস্কৃত সাহিত্যিকরা বলেছেন, প্রতিক্ষণেই নতুন লাগা-টা রমণীয়তার স্বরূপ। কালিদাসের মেঘদূত সেই অর্থেই রমণীয়। যে-মেঘমন্দ্র শ্লোকের নিবিড় সংগীতে বিশ্বের বিরহবেদনা পুঞ্জীভূত, তার অনুবাদ অসম্ভব মনে হ'লেও চেষ্টা না-ক'রে উপায় নেই। ওদিকে Wilson, Jones প্রভৃতি, এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরদাচরণ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক দিন আগে এ-কাজে হাত দিয়েছিলেন। তারপর অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে বাংলা দেশে, যদিও সংখ্যার সঙ্গে গুণের অনুপাত তেমন আশাপ্রদ নয়। আমি পদ্যানুবাদের কথাই বলছি।

'কবিতা'য় পূর্বমেঘের অনুবাদ দেখে খুশি হলাম। আরও খুশি হলাম বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ ব'লে। পড়তে বসলাম অনেক আশা নিয়ে। সানন্দে স্বীকার করি নিরাশ হ'তে হয় নি। কয়েকবার পড়বার পর প্রসঙ্গত দু'একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অনুবাদে সাত মাত্রার চতুষ্পর্বিক (অপূর্ণপদী) ছন্দ নির্বাচন খুবই সংগত। লঘুগুরুভেদে যতিবিন্যস্ত মন্দ্রাক্রান্তার রূপটা দাঁড়ায়: — — — — । ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ — । — ‿ — — ‿ — — । ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ গণবিন্যাসকে মাত্রায় বিশ্লিষ্ট করলে দাঁড়ায় ৮।৭।৭।৫। হলন্তকে দ্বিমাত্রিক ধ'রে মন্দাক্রান্তার অনুকরণ করা চলে বটে, কিন্তু প্রথম পর্বটি ৮ মাত্রার আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বটি ৭ মাত্রা হওয়ার দরুণ বাংলা ছন্দের মূলনীতির বিরোধিতা হয়, তাছাড়া স্বরধ্বনির দীর্ঘীকরণ বাংলায় চলবে না ব'লে গুরু অক্ষরের জন্যে কেবলমাত্র হলন্ত অক্ষর প্রয়োগে মূলের ধ্বনিকল্লোল আনাও সম্ভব হয় না। অতএব বাংলার নিজস্ব ছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্তকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নিলে সপ্তমাত্রিক চতুষ্পর্বিক (অপূর্ণপদী) চরণই এই দীর্ঘায়ত ছন্দের অনুবাদে সবচেয়ে উপযুক্ত: ৭।৭।৭।৫, ৭।৭।৭।৪ ; বা ৭।৭।৭।৩।

এর আগে সপ্তমাত্রিকে পর্বান্তিক যমক এবং চরণান্তিক মিল পেয়েছি, যা বুদ্ধদেব বসু বর্জন করেছেন। এতে অনুবাদ মূলের স্বভাবানুবর্তী হয়েছে।

শেষের পর্বটিতে তিনি অনিয়মিতভাবে কখনো ৫, কখনো ৪ বা ৩ মাত্রা রেখেছেন। এতে বৈচিত্র্য বেড়েছে।

অনুবাদে চলতি ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অব্যয় ইত্যাদি প্রয়োগ তিনি নীতিগতভাবেই করেছেন মনে হ'ল। আধুনিক পাঠক এতে খুশি হবেন। কিন্তু 'যবে' 'পুন', 'তায়', 'যতেক', 'যেথা', 'সেথা' দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে', এবং পাদপূরণে 'রে' এ-সবের প্রয়োগ কেন?

সতর্কতা সত্ত্বেও ১১ শ্লোকের তৃতীয় চরণে, ৪০ শ্লোকের তৃতীয় চরণে, ৪২ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে কিঞ্চিৎ গুরুচণ্ডালী ঘটেছে। তৎসম শব্দবহুল গাঢ়বন্ধের সঙ্গে এই সব চরণের পর্ববিশেষ খাপ খায়নি ব'লে মনে হল।

> প্রভাবে হয় যার পৃথিবী উর্বর, এবং ভ'রে ওঠে শিলীন্ধ্রে
> শ্রবণরমণীয় তোমার সেই নাদ শুনবে চঞ্চল মরালদল,
> পাথেয় পদ্মের টুকরো কচি ডাঁটা, মানস-উদ্দেশে উৎসুক
> আকাশ-পথে, সখা, আকৈলাস ওরা তোমার হবে সহযাত্রী।

এই শ্লোকে পূর্বাপর পর্ববিন্যাসে 'টুকরো কচি ডাঁটা' একটু প্রাকৃত। ['বিসকিশলয়চ্ছেদ' কথাটির অনুবাদে মৃণাল-কিশলয়ের মতো সুশ্রাব্য শব্দকে হটিয়ে পদ্মের কচি ডাঁটা না-বললেও হ'ত। 'খণ্ড' অর্থে 'ছেদ' কথাটির অনুবাদও ('টুকরো') এখানে অপরিহার্য ছিল না।]

এই রকম 'চটুল পুঁটিমাছ' (৪০)-এর বিশেষণ 'ধবল কুমুদের কান্তি' একটু গুরুভার। তেমনি, 'নাসিকারন্ধ্রের মধুর বৃংহিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল' (৪২) এই চরণে শেষ পর্বটি বড় দুর্বল।

কবিতায় শব্দপ্রয়োগের আধুনিক কলাকৌশলের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল হ'য়েই এ-কথা বলছি।

৯ শ্লোকে 'ভবন্তং' পদের অনুবাদ করা হয়েছে 'আপনাকে'। সেইসঙ্গে পাদটীকায় বলা হয়েছে "যক্ষ মাঝে-মাঝে মেঘকে 'আপনি' বলছে। ৩৮ ও ৫১নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।" অনুবাদের এই অংশটুকু এবং তার সঙ্গে এই মন্তব্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। মেঘকে 'তুমি' সম্বোধনে যে-আবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে আপনি সম্বোধনে ঘটে তার মহতী বিনষ্টিঃ। একবার 'তুমি' আর একবার 'আপনি' সম্বোধন এমনি তো কানে বাজেই, তাছাড়া 'আপনি' সম্বোধন

নিঃসন্দেহে কবিতার রসাপকর্ষক। সংস্কৃতে আভিধানিক অর্থে 'ভবৎ' শব্দ সম্মানার্থক বটে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নিশ্বাসেই যুষ্মদ্ শব্দ আর ভবৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে কাব্যে, নাটকে—সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে। সম্পর্কে বড়কে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও যেমন, সম্পর্কে ছোটর ক্ষেত্রেও তেমনি যুষ্মদ্ আর ভবৎ শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায়। 'ভবতোঽয়ং ব্যাপারঃ। তৎ কিমিতি ত্বম্ উচ্চৈঃ শব্দং কৃত্বা স্বামিনং ন জাগরয়সি' (হিতোপদেশ)। এর অনুবাদ যদি করা যায় 'ব্যাপারটা আপনার, অতএব তুমি কেন উচ্চ শব্দ ক'রে প্রভুকে জাগাচ্ছ না?' তবে কেমন লাগে শুনতে? উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাস থেকে ভারবি-মাঘ পর্যন্ত যে-কোনো কবির কাব্যগ্রন্থের পাতায় আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। অনুবাদের এই আদর্শ মেনে নিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক আবেগমধুর অংশে, যেখানে নায়ক-নায়িকার প্রেম পরিণতি লাভ করেছে (অন্তত 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে অবতরণের রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি কেটে যাবার পর), সেখানেও দুজনের কথোপকথনের অনুবাদে আপনি-তুমির মিশ্রণ ঘটাতে হবে।

অনুবাদে ন্যূনপদতা ও অধিকপদতাও সর্বত্র এড়ানো যায়নি। ২৫ শ্লোকে 'নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেং'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'নীচৈ গিরি সেই নগরে আছে···' ইত্যাদি। মূলে 'আখ্যা' কথাটি অপ্রয়োজনীয় নয়। 'নীচৈঃ' শব্দটি সংজ্ঞা না-বুঝিয়ে 'নিম্ন'ও বোঝাতে পারত ব'লেই 'নীচৈরাখ্যং গিরিম্' লেখা হয়েছে। এটা নিছক পাদপূরণ ব'লে মনে হয় না। তাই অনুবাদ 'নীচৈ নামে গিরি' করলে ভালো হত না কি? আর মূলে 'তত্র' শব্দটি যখন 'বিদিশা'কে স্পষ্টত নির্দেশ করছে তখন 'সেই নগরে' না-ক'রে 'সেখানে' পদই চলত। সপ্তমাত্রিকতা বজায় রাখাও মুশকিল হ'ত না। এই শ্লোকেই আবার মূলানুগত 'নাগর' শব্দটি কানে বাধে। 'নাগর' শব্দটি সংস্কৃতে নাগরিকদের বোঝালেও বাংলায় 'প্রেমিক' (অবৈধ অর্থেই বেশি) অর্থে রূঢ়। মূলের অর্থ সাধারণ নাগরিক, প্রেমিক নয়। 'বারাঙ্গনা' শব্দটির সান্নিধ্য আছে ব'লে 'নাগর' শব্দটি 'অবৈধ প্রেমিকে'র অর্থই বহন করবে। কিন্তু মূলের অর্থ তো তা নয়। তখনকার সমাজব্যবস্থায় বারাঙ্গনাবিলাস এখনকার অর্থে অবৈধ বা নিন্দনীয় ছিল কি?

এই শ্লোকের দ্বিতীয় দুই চরণের বাক্যগঠনও মূলানুগামী। 'রতিপরিমলোদ্গারিভিঃ' শব্দটি 'শিলাবেশ্মভিঃ' পদের বিশেষণ। রতিপরিমলোদ্গারীর অর্থ 'অঙ্গপরিমলে লিপ্ত' পর্বটিই বহন করছে। 'উদ্দামানি যৌবনানি'র জায়গায় 'রতির উদ্গারে মত্ত যৌবন' করার দরকার কী? শুধু মত্তই তো উদ্দামানির অর্থ দিচ্ছে। 'রতির উদ্গার' কথাটি প্রয়োগ করলে যথাস্থানে, অর্থাৎ শিলাগৃহের বিশেষণ হিসেবে করা উচিত ছিল। তা ছাড়া রতি-পরিমলের উদ্গার আর রতির উদ্গার কি এক? 'রতির উদ্গার' কথাটি প্রায় গ্রাম্যতাদোষের পর্যায়ে প'ড়ে যায়।

৩৫ শ্লোকে শেষের চরণে 'নগর' কথাটি অপ্রয়োজ্য। 'নগ' বিশেষত মানুষের নখ এবং নখর সাধারণত মানবেতর জীবের তীক্ষ্ণধার নখকেই বোঝায়' (বাংলাভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)। 'নখক্ষত' কথাটি রাখতে পারলে ভালো হ'ত। প্রিয়ার দেহে প্রেমিকের নখক্ষতকে 'নখরের আঘাত' বললে সে-আঘাত কি কাব্যদেহেই গিয়ে পড়ে না?

কিন্তু এহো বাহ্য। সমগ্রভাবে কবিতাটি পাঠ করলে এ-সমস্ত খুঁটিনাটি কথা মনেই আসে না। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অনুবাদে মূল কাব্যের আত্মা বিধৃত হয়েছে, এবং সেইটাই বড় কথা। আমরা সাগ্রহে উত্তরমেঘের অপেক্ষায় থাকলাম।

কলকাতা

জ্যোতিভূষণ চাকী

'কবিতা' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'মেঘদূত' অনুবাদ করবার যে সৎ প্রচেষ্টা করেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাই। যদিচ একথা স্বীকার্য যে সংস্কৃত কাব্যের, বিশেষত 'মেঘদূত'-এর, ঊর্মিমুখর ঘনগর্জন বাংলাভাষার ললিত কণ্ঠে ফোটানো দুরূহ, এবং সে-জিনিশ ফোটাবার চেষ্টা করতে গেলে বাংলা ভাষাকে প্রায় জাত খোয়াতে হয়, তবুও, আমার মনে হয়, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসে এবং বিশ্বস্তচিত্তে এই অনুবাদ থেকে কালিদাস আস্বাদ করতে পারবেন।

'মেঘদূত' কাব্যে যে ঘনসংবদ্ধ চিত্রকল্পগুলি ছিল, সেগুলি অনুবাদে ঠিকমত রক্ষিত হয়নি (হয়তো করা সম্ভব নয়) ব'লে মনে হ'ল। সংস্কৃতের ঘন

পরমান্নে যেন বাংলার বেনো জল এসে ঢুকেছে, সবটাই কেমন পাৎলা হয়ে গেছে। 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ'— এই শোনা মাত্র আমাদের চোখের সামনে যেন উজ্জয়িনীর আকাশ নেমে আসে, তার ঘনবদ্ধ বিশাল সংস্কৃত মেঘরাশি আমাদের মনের উপর বিরাট বোঝার মতো চেপে বসে। কিন্তু 'দেখলো মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে। বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে'— এ যেন সেই ঘনব্যাপ্ত মেঘকে উপস্থাপিত করতেই পারলো না, একরাশ জলরঙের ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ নিয়ে আমাদের মনের আকাশে হাজির হ'ল।

'পূর্বমেঘ' পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু তেষট্টিটি শ্লোকের অনুবাদ ক'রে আপাতত কর্তব্য সাঙ্গ করেছেন। কিন্তু, আমার যতদূর জানা আছে, 'পূর্বমেঘ'-এর শ্লোকসংখ্যা চৌষট্টি। অপসারিত শ্লোকটি 'পূর্বমেঘ'-এর দ্বাবিংশতম শ্লোক, এবং সেটি প্রক্ষিপ্ত নয় ব'লেই মনে হয়।

অন্তোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরী সম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥

এত কথা ব'লেও কিছু বলা হবে না, যদি না স্বীকার করি যে, চলিত ক্রিয়া প্রয়োগ ক'রেও সংস্কৃত ঢেউ ধরবার যে চেষ্টা করা হয়েছে (যা বহুস্থানে প্রায় সফল) তা শুধু উপভোগ্যই নয়, "নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য"। ছন্দোজ্ঞানী বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে যে অসামান্য হাত সে-কথা পুনর্বার প্রমাণিত হ'ল, এবং সর্বোপরি, 'মেঘদূত' অনুবাদের ভিতর দিয়ে তাঁর পুরাতনী স্বচ্ছ মনের পুনরাস্বাদ পেয়ে আমি আহ্লাদিত হলাম।

কলকাতা **তন্ময় দত্ত**

লেখকের বক্তব্য

পত্রলেখক-দ্বয় আমার অনুবাদে যে-সব ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা ভাষার স্বভাবের জন্যই অনেক ত্রুটি প্রতিকারহীন; যে-সব স্থলে এখনো সংশোধনের অবকাশ আছে, আমি আবার চেষ্টা করবো।

কিন্তু 'আপনি-তুমি' বিষয়ে শ্রীযুক্ত চাকীর সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলুম না। তাঁর নজির অস্বীকার করছি না; সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণভাবে সর্বনাম দুটি বিনিময়ধর্মী হ'তে পারে; কিন্তু 'মেঘদূতে' যক্ষের মুখে 'আপনি'টা প্রত্যেক বারই বিশেষ অর্থ পেয়েছে ব'লে আমার ধারণা: সে-অর্থ চাটুকারিতার। যক্ষ রাজপুরুষ, অতএব চাটুবাক্যে নিপুণ; মেঘকে আবেদন জানাবার প্রাক্কালে সে মেঘের মহৎ বংশের যথারীতি উল্লেখ করেছে, এবং উত্তরমেঘের শেষাংশে মেঘের গুণ গাইতেও ভোলেনি। মনে হয়, আপন দুঃখের বেগে কথা বলতে-বলতে যক্ষের হঠাৎ মাঝে-মাঝে মনে প'ড়ে যাচ্ছে, তার সম্মুখবর্তী মেঘ কত বড়ো অভিজাত ও সজ্জন, আর তার এই প্রার্থনা কত অনুচিত, এবং তখনই 'আপনি' সম্বোধন ক'রে তার অবস্থার উপযোগী বিনয়প্রকাশের চেষ্টা করছে (উত্তরমেঘের উপান্ত্য শ্লোকে এই ভাবটি সুস্পষ্ট)। আমি তাই, অনভ্যাসজনিত আপত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও, 'ভবৎ' স্থলে সর্বত্রই 'আপনি' রেখেছি।

'অন্তোবিন্দুগ্রহণচতুরাং···' শ্লোকটি অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত, তাঁদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংশোধন

'কবিতা'র গত আশ্বিন সংখ্যায় 'ডিলান টমাস' প্রবন্ধে টমাস-এর মৃত্যুর তারিখ ১৯৪৩ ছাপা হয়েছিলো। না-বললেও চলে, তারিখটি আসলে ১৯৫৩।

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র কবিতা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে থাকে; বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা কবিতার গঠন বিষয়ে গবেষণা করছেন। * **উৎপলা মুখোপাধ্যায়** নানা পত্রিকার লেখক, থাকেন রাঁচিতে। * **জ্যোতিভূষণ চাকী** দক্ষিণ কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন,

প্রাচীন ও আধুনিক বহু ভাষায় তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। **গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়**-এর জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩১৯-এ ; তিনি সংস্কৃত কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ উপাধি নিয়েছেন, 'রাজকন্যা' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কর্ম করেন কলকাতায় রেল-দপ্তরে। * **তন্ময় দত্ত** কলেজের ছাত্র। * **তপন চট্টোপাধ্যায়**-এর বর্তমান বয়ঃক্রম উনিশ, ইনি কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি। * **তারক সেন** বার্নপুরে লোহার কারখানায় চাকরি করেন। **দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়** 'নীলাম্বরী' কাব্যগ্রন্থের লেখক। **বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'অবতামসী : আবার রাত্রি' ; ইনি 'কবিতা'য় গত দশ বছর ধ'রে লিখছেন। **বিষ্ণু দে**-র 'হে বিদেশী ফুল' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ; এটি তাঁর কাব্যানুবাদের সংগ্রহ। * **বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত** কলকাতায় কলেজে পড়েন। **বুদ্ধদেব বসু**-র নতুন প্রবন্ধের গ্রন্থ 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' বর্তমানে যন্ত্রস্থ : প্রকাশ করছেন বেঙ্গল পাব্লিশার্স। * **মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র ; তাঁর একটি কবিতার বই ও ছোটোদের জন্য বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 'আকাশ', 'দিগন্ত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা **মৃণালকান্তি** (দাশ) সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পদবীত্যাগ করেছেন। তাঁর আদি-নিবাস শ্রীহট্ট, 'কবিতা'র সঙ্গে সংস্রব বহুকালের। বর্তমানে তিনি ভারতের নানা তীর্থে ভ্রাম্যমাণ। **মোহিত চট্টোপাধ্যায়** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পড়েছেন, 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' নামে তাঁর একটি কবিতার বই ছাপা হয়েছে। **রাজলক্ষ্মী দেবী** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্তের দিন' 'কবিতা'র আষাঢ় ১৩৬৩ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। **শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়** কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, এখন সরকারি কর্মে নিযুক্ত আছেন। **শান্তিকুমার ঘোষ** বর্তমানে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ গবেষণা করছেন। **শোভন সোম** শান্তিনিকেতনে চিত্রকলা ও রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা করেছেন, এখন মধ্যপ্রদেশে অধ্যাপক। * **সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়**-এর জন্ম ১৯১৩-তে ; প্রকাশিত কবিতার বই 'আকাশ-মাটির গান'। ইনি হাওড়াতে সংগীতের শিক্ষকতা করেন। **সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত**-র প্রথম কবিতার বই আশুপ্রকাশ্য।

KAVITA

(Poetry)

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50

Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE

Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Navana Printing Works Private Ltd., 47 Ganesh Chunder Avenue, Calcutta-13

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ
কারণ
গুণে অতুলনীয়

বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ,
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক : নরেশ গুহ।
কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে প্রকাশিত ও ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।